শালবন

শ্রীঅপরাজিতা দেবী

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড
১১৯ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ
প্রকাশক : শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, এম-এ
১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা

১৯৪৫
মূল্য দুই টাকা

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেডের
মুদ্রণ বিভাগে [অবিনাশ প্রেস—১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট,
কলিকাতা] শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, এম-এ কর্ত্তৃক মুদ্রিত

শালবন

ঘর বাঁধিয়াছি প্রান্তরে।—প্রসারিত বিস্তৃত প্রান্তর।- ঈষৎ শুষ্ক তৃণাচ্ছাদিত গৈরিকবর্ণ সে উদার প্রান্তরের পরপারে শিশু শালবন রেখা। বৈশাখী উষার আলোকদীপ্ত আনত দিগন্ত তলে অতি দীর্ঘ সবুজ রেখা আঁকিয়া সুশোভন শালবন।

উত্তরে অতি নিবিড় নীলাভ কৃষ্ণ বৃক্ষ-প্রাচীর, সে প্রাচীরের পরে পূর্ব পশ্চিমে রক্ত কঙ্করময় উচ্চ পথ, পথের দুই ধারে শ্রেণীবদ্ধ তরুশ্রেণী,—শাল, মহুয়া, শিরিশ, শিশু, বকুল, আম, অশ্বত্থ, বট, চন্দন, কড়ি, নিম, আমলকী, মেহগিনি, সেগুন, বাবলা, মন্দার।

পথের ওপারে বিশাল হিজলী বন্দীবাস, লৌহময় প্রকাণ্ড গেট, সশস্ত্র শান্ত্রী দল। গেটের আলোকাধার অতি বৃহৎ—বহু দূর পর্যন্ত সে আলোকে উজ্জ্বল হইয়া থাকে সমস্ত রাত্রি। সর্বাপেক্ষা এই আলোকটিই বৃহৎ। ইহা ভিন্ন বহু সংখ্যক আলো বন্দীবাসে, অগণ্য নক্ষত্রের মত এই আলোকমালা এবং বন্দীবাসের সু-উচ্চ গম্বুজ চূড়া দেখিতে দেখিতে যায় পুরী মান্দ্রাজ যাত্রী।

বন্দীবাসের পরে রেল লাইন বাঁকিয়া দক্ষিণ-পূর্ব দিকের ঘন জঙ্গলের ভিতর চলিয়া গিয়াছে। লাইনের ওপারে উত্তরে দূরে দূরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোকালয়। দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম লোকালয়শূন্য। পূর্বদিকে মাত্র শান্ত্রী-প্রহরীর নিবাস এবং অপর একটি সুদৃঢ় বৃহৎ বন্দীশালা। সেটা এখন কর্মচারীদের বাসগৃহ। সেই বন্দীশালাটি বেষ্টন করিয়া কঙ্করময় উচ্চ বাঁধানো পথটির শেষ। এ পথটি শুধু এই বিষম অরণ্যের মধ্যে একবিন্দু নগরীটির প্রয়োজনের নিমিত্ত।

অতি সঙ্কীর্ণ বিন্দুপ্রমাণ নগরী—সীমাবদ্ধ লোকাবাস, তাহার চারিদিকে শুধু অবারিত প্রান্তর এবং শালবন। সেই শালবন কোথাও গগনস্পর্শী উচ্চ, কোথাও বা নিবিড়তায় দুর্ভেদ্য,—কোথাও অনুচ্চ ক্ষুদ্র,—কচিৎ কোথাও বিরল।

কিন্তু দক্ষিণের ঐ উদার উদাস প্রান্তরের পরপারে যে নিবিড় সবুজ—সুন্দর শিশু শালবন,—সে অনুপম—অদ্বিতীয়—তার তুলনা কোথাও নাই।

ঐ শালবনের ভিতরে আছে বহু আঁকা বাঁকা ক্ষীণ পথ,—বনের ওপারের অধিবাসীরা সেই পথে যাতায়াত করে,—তাহাদেরই পায়ে পায়ে সবুজ বনের মধ্যে লাল রেখা আঁকিয়াছে, নিঃশঙ্ক নির্ভীক তাহারা, সন্ধ্যায় রাত্রে ঐ সুবিস্তৃত বন পার হয়,—কখনো একা, কখনো বা সাথী সঙ্গে।

শ্রেণীবদ্ধ বৃক্ষচ্ছায়াস্নিগ্ধ উচ্চ প্রশস্ত বাঁধানো পথটি ধরিয়া চলিয়া যাও—কিছুদূর গেলে বাঁ দিকে কেশিয়ারী যাইবার পথ। দক্ষিণের পথটি বরাবর খড়্গাপুর গিয়া উঠিয়াছে। এই দুই পথ ছাড়াইয়া আরো কিছুদূর গেলে পথের উভয় দিকে বহু সুন্দর সুদৃশ্য দ্বিতল গৃহ এবং বাংলো বাড়ী। এককালে হিজলী সহর হইবার কথা ছিল—সেই সময়কার প্রচেষ্টার নিদর্শন সর্বত্র। এখন শুধু ঘোর জঙ্গলে লোক-চিহ্ন বর্জিত স্থানে শোভন গৃহগুলি শূন্য পড়িয়া আছে। এই নির্জন প্রদেশে একটি অতি বৃহৎ বিল,—চারিদিকে ঘন শাল জঙ্গল। উচ্চ বাঁধানো পথটি বিলের পার ঘুরিয়া গিয়াছে চক্রাকারে—এইটিই হিজলীর প্রধান পথ।

কিন্তু ও পথ কি ভাল? প্রকৃত পথ ও নয়, ও সযত্ন রচিত কৃত্রিম পথ—দৃশ্যতঃ সুন্দর এবং ব্যবসার খাতিরে নির্মিত। এ পথে পথ চলিবে কেন?—কিসের দুঃখে?—কি অভাব তোমার?—ও পথ ছাড়িয়া এসো দক্ষিণে,—এসো বনপথে, যে পথ বিনা চেষ্টায় আপনা হইতে গড়িয়া উঠিয়াছে, সেই পথে। এসো বনমধ্যে—বনপার্শ্বে—প্রকৃতি মায়ের অঞ্চলতলে অর্দ্ধ লুক্কায়িত প্রচ্ছন্ন বিসর্পিত পথে—যে পথের আনন্দ অনাবিল,—গতি স্বচ্ছন্দ—বাধাহীন, লীলায়িত দৃশ্য অকৃত্রিম অম্লান।

এই দক্ষিণ, সম্মুখে দক্ষিণ, দক্ষিণের ঐ গৈরিক তৃণাবৃত প্রান্তর, প্রান্তর সীমায় সায়াহ্ন আকাশে ঘোর সবুজ রেখা আঁকা শালবন।

প্রান্তরমধ্যে স্থানে স্থানে এক একটি প্রাচীন সু-উচ্চ শালবৃক্ষ প্রান্তররক্ষীর ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

প্রান্তর সীমার শিশু শালবন অতি নিবিড়, অতি বিস্তৃত এবং যোজন ব্যাপী। বনের স্বত্বাধিকারী কয়েক বৎসর পরে পরে সমগ্র বন কাটিয়া বিক্রয় করিয়া দেয়, সেই জন্যই এই শালবন চির-শিশু। কাটিবার সময় ছোট ছোট দু' চারিটি গাছ থাকিয়া যায়—কাটা পড়ে না। তাহারা এই শিশু শালবনের রক্ষী এবং সীমান্তরক্ষী। সীমান্তরক্ষীগণ তরুণ উজ্জ্বলকান্তি এবং নমনীয় কোমল, প্রান্তররক্ষীর ন্যায় অতি বৃহৎ এবং প্রাচীন নয়।

* * * * *

ঐ আসে শৃগাল, শালবন মধ্য হইতে বাহির হইয়া মাঠে দাঁড়াইল,—ঐ আর একটি, এক—দুই—তিন—চার, কি চকিত চঞ্চল উহারা!—শুধু স্বভাবসিদ্ধ সতর্কতা,—নতুবা নির্জন মাঠে কোন ভয়? বনপালিত পশুপক্ষী কি সজীব সতেজকান্তি,—গৃহের পরশ লাগিলে নিস্তেজ নিরুৎসাহ রূপ ধরে।

দুইটি শিয়াল ছুটিতেছে, যায় যায়, ফিরিয়া ফিরিয়া চারিদিক দেখে,—ডাইনে বাঁয়ে—পিছনে সামনে—সমান সজাগ দৃষ্টি। একটা শিয়াল দাঁড়াইয়া হঠাৎ গা ঝাড়া দিল। শিয়াল গা ঝাড়া দিলে তাহার সর্বাঙ্গে একটা ধূসর শুভ্র দীপ্তি ঝলকিয়া উঠে। ঐ আর একটা আসিল এতক্ষণ পরে!—শালবনের কিনারের পথে একে একে সকলে চলিয়া গেল। আবার আসিবে প্রহর ঘোষণা করিতে।

দ্বিপ্রহর। প্রান্তরমধ্যে শালবৃক্ষ তলে রাখালের দল শুইয়া আছে।—তীব্র রৌদ্রঝলসিত মাঠে চরিতে চরিতে গো-পাল একবার গাছ তলায়

দাঁড়াইয়াছে ছায়ার আশায়। গ্রীষ্মের তীক্ষ্ণ রৌদ্রে শালবন, গৈরিক মাঠ, শুভ্র দিগন্ত জ্বলিতেছে। সহসা একটি অতি মৃদু বাতাস ভাসিয়া আসিল কেন?

পাটলবর্ণ রুক্ষ কঙ্করাকীর্ণ ভূমি—পাটলবর্ণ তৃণগুচ্ছে শ্বেত নীল তৃণ পুষ্প। কোথাও রক্তবর্ণ মূল হইতে উত্থিত নিষ্পত্র দীর্ঘ সরল তৃণদণ্ড,—দণ্ডের শিরোভাগ কদম্ব পুষ্পের ন্যায় শুভ্র কেশর-মণ্ডিত। কোথাও তৃণ-ঝোপের মধ্যে ঘোর-রক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুল প্রবালবিন্দুবৎ জ্বলিতেছে। কে দেখে? কে জানে? কে রাখে সন্ধান? জননী পৃথিবীর অমূল্য সম্পদ, অনন্ত বিস্তৃত শ্যামাঞ্চল ছায়াতলে কত দুর্লভ মণিমুক্তা লুকানো, খুঁজিয়া কি দেখিয়াছ?

কি আকর্ষণ ঐ শালবনের!—ঐ সবুজ শিশু শালবন, যার কিনারা ঘেঁসিয়া পথ চলিয়া গিয়াছে দূর দূরান্তরে—পূর্ব হইতে পশ্চিমে, ঐ আঁকা বাঁকা উঁচু-নীচু পথ—কোথাও অদৃশ্য কোথাও প্রকাশ,—কখনো প্রশস্ত কখনো সঙ্কীর্ণ, ঐ পথ যত্নরচিত নয়, জুতার ছাপ পড়ে না যে পথে,—বিলাসিতার গাড়ি-পাল্কী যান-বাহন চলে না যেখানে। ঐ পথ শুধু রাখালের—কাঠুরিয়ার—বন্য জাতীর বনবাসীর, সবুজ বনের প্রান্ত ঘেঁসিয়া রক্তবর্ণ পথ কোথা হইতে আসিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে!—

বন ছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ
আমার মন ভুলায় রে!—

কিন্তু উত্তর দিকে চাহিও না, সে দিক কোলাহলময়। সে দিকে কেনা-বেচা দোকানদারী। কত কলকব্জার কাজ,—কত ছুটাছুটি—উচ্চকণ্ঠ হাঁক-ডাক,—বিরাম নাই, নিবৃত্তি নাই। অহর্নিশি কর্মব্যস্ত সংসারী। নাই তৃপ্তি,—নাই বৈচিত্র্য,—আছে শুধু আকাঙ্ক্ষা, শুধু দেনা-পাওনা, শুধু অতৃপ্তি। প্রবলবেগে সংসার যন্ত্রের চক্র ঘূর্ণায়মাণ।

কিন্তু এই দক্ষিণ,—প্রসন্ন-প্রসারিত দক্ষিণ—অবারিত নিঃশব্দ দক্ষিণের উজ্জ্বল সবুজ শালবন।

কি আছে ঐ বনের মধ্যে? কি আছে বনের ওপারে? অজ্ঞাত বন হিংস্র প্রাণীর নিবাস।

কিন্তু অজ্ঞাত রহস্য জানিবার ইচ্ছা মানবের চিরন্তন

শালবন বার্তা

কি আশ্চর্য! কি সুন্দর! এমন নিশ্ছিদ্র নিবিড় বনের মধ্যে এমন স্বচ্ছন্দতা? ছোট ছোট গাছের ছোট ছোট ডালপালা অতি স্বাধীন ভাবে ছড়ানো। গাছগুলিও আদৌ ঘনসন্নিবিষ্ট নয়। গাছ ছোট বটে কিন্তু ছোট অর্থে কি বুঝিয়াছ? উচ্চতায় তোমার চেয়ে অনেক বড়। তোমার মাথা ছাড়াইয়া অনেক উচ্চে অনেক উর্ধ্বে তাহারা, আবার তোমার চেয়ে ছোটও আছে। বনের মধ্যে নির্দিষ্ট কোনো পথ নাই,—কিন্তু বৃক্ষের পাশে পাশে ঘুরিয়া ফিরিয়া চলিতে কোনই অসুবিধা নাই। পথহীন পথ বটে—কিন্তু স্থান সঙ্কীর্ণ নয়। প্রান্তরের ন্যায় বনতল দুর্বাচ্ছন্ন নয়। মৃত্তিকা কোথাও রক্তবর্ণ, কোথাও গৈরিক, উজ্জ্বল গৈরিক। ভূমি উচ্চ নীচ বন্ধুর। সতর্ক হইয়া না চলিলে হঠাৎ শাখাগ্রে বাধিয়া অবশ্য পতন।

বনের মধ্যে কত কুল, করমচা, চালতা, জাম, লেবুগাছ। ইহারাও বনের সঙ্গে প্রতি বার কাটা পড়ে। সেই কর্তিত মূল হইতে গুচ্ছ গুচ্ছ নবীন শাখা এবং পত্ররাশি বাহির হইয়া বাড়িয়া উঠিতেছে। স্থানে স্থানে রাশি রাশি শুভ্র বনফুল ফুটিয়া বন-দেশ আলো হইয়া আছে। সুমিষ্ট মৃদু সৌরভ সে ফুলের। কে আনিল বন মধ্যে এই ফল-পুষ্প তরুরাজি? লোকচক্ষুর অগোচরে এই অপরূপ ঐশ্বর্য? অথবা পৃথিবীর সমস্ত রহস্য, ভীষণত্ব এবং সৌন্দর্য লোক-চক্ষুর অন্তরালেই বটে। কিন্তু দুঃসাহসী মানুষ কিছু কিছু আয়ত্তে আনিয়াছে। কতক নিজ প্রয়োজনের নিমিত্ত। কতক কৌতূহলের বশবর্তী হইয়া।—

দুরারোহ পর্বত দুরবগাহ সমুদ্র—দুর্গম সুন্দর বন এক দিন কি অজ্ঞাত—অনাবিষ্কৃত ছিল না?

বন আর বন, শেষ কই? ক্রমে সন্ধ্যা নামিল, বন মধ্যে ছায়া হইয়া উঠিল গাঢ়তর। আর অগ্রসর হইবার উপায় রহিল না।

* * *

কিন্তু আমার দিন গেল—রাত্রি গেল—সুখ গেল শান্তি গেল!—শুধু অশান্তি আর অতৃপ্তি! কি আছে ঐ শালবনের মধ্যে? কি আছে বনের ওপারে? যে পথহীন পথ ধরিয়া যাইতে যাইতে ফিরিয়াছি কত দূরে সে পথের সীমা? কোথায় গিয়াছে সে পথ?

এ পথ গেছে কোন খানে?
কে জানে—তা কে জানে?
কোন পাহাড়ের ধারে—কোন সাগরের পারে
কে জানে তা—কে জানে?

হায় কে জানিবে? ঐ বিষম বনের মধ্যে কাঠুরিয়া সাঁওতাল ছাড়া তো কেহ যায় না? কিন্তু তারা তো শুধু যায় আসে, শুধুই পথিক, বনের বার্তা জানিবে কি?

কেন আমায় নিষেধ কর? আমিও বন্য, আমি জঙ্গলী। আমি বেপরোয়া, আমি স্বাধীন। আমি বাধা নিষেধ মানি না—মানি না তোমাদের লোকসমাজ। বন্য যে, তার কিসের ভয়? বনের সঙ্গে যার মনের মিলন বনের শেষ দেখিবে না সে?

ঐ শালবনের নীরব আহ্বান উপেক্ষা করিব কি সাধ্য? এসো যাই, এসো এসো, সেই যে বিস্তৃত লজ্জাবতী বন উন্মুখভাবে বিকশিত হইয়া আছে স্পর্শের আশায়,—নির্ভয়ে অভিযান করি এসো।

বনাভ্যন্তরে ছায়াময়। বৃষ্টিতে গেরুয়া মৃত্তিকা স্থানে স্থানে পিচ্ছিল। ছড়ানো ডালপালা এবং শাল পাতার জল গায়ে ঝরিয়া পড়ে। কি অপূর্ব

অনুভূতি! অন্তরে চমকপ্রদ আনন্দ—ঈষৎ ভীতিজনক দুর্দম আগ্রহ! কি নির্জন নীরব-বন, কোথাও জনপ্রাণীর সাড়া নাই। একটা শৃগাল পর্যন্ত দেখি না। কত শৃগাল এই বনের ভিতর হইতে দলে দলে বাহির হয়। কোথায় তারা?

পূর্বদিন যতটুকু প্রবেশ করিয়াছিলাম তাহা পার হইয়াছি, এবার বনের অভ্যন্তর প্রদেশ। সাদা বনফুলরাশি উর্ধ্বমুখে ফুটিয়া আছে। বৃষ্টিভিজা মাটিতে বড় বড় গোল গোল পায়ের ছাপ, বাঘ নয় তো? না বাঘ নয়। কাঠুরিয়ারা তো নিত্য এখানে আসে। অপর কোনো বন্য প্রাণী।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা, বনের শেষ নাই,—গতিরও বিরাম নাই। বহুক্ষণ, কতক্ষণ ঠিক নাই—কিন্তু অনেকক্ষণ পরে বন যেন ক্রমে ফাঁকা দেখাইতে লাগিল। গাছপালা তত ঘন নয় আর। এক একটি চূড়ার মত প্রকাণ্ড উইয়ের উঁচু উঁচু ঢিপি। উহার ভিতরের অংশ অনেকটা ক্ষয়িত। অনায়াসে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারা যায়। ভূমিভাগ ক্রমোচ্চ। স্থানে স্থানে এক এক খণ্ড বৃহৎ পাথর পড়িয়া আছে, রৌদ্রে বৃষ্টিতে পাথরগুলি কৃষ্ণবর্ণ।

বিরল বন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা!—বনের শেষ কই? ঐ বেলা যায়, শেষ না মিলিলে এই পথেই ফিরিতে হইবে এবং কিছুদূর চলিতেই রাত্রি হইবে, কি দশা হইবে তখন? এই যে গাছের পর গাছ ও ডালপালা সরাইয়া, কাঁটা ছাড়াইয়া উঁচু নীচু বক্র পথে ঘুরিয়া ফিরিয়া চলা, এমনি কি সমস্ত রাত্রি কাটিবে?

অনেকক্ষণ পরে ক্রমে বৃক্ষ গুল্ম ঝোপ বিরল হইতে হইতে বন প্রায় শেষ হইল।

এ এক অপূর্ব দেশ সম্মুখে,—সবুজ ঘাসে ঢাকা সুবিস্তীর্ণ মাঠ। সবেমাত্র গ্রীষ্মের শেষে অল্প অল্প বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু এই দিকে যেন অবিরাম বৃষ্টি চলিযাছে। নতুবা এমন সতেজ সবুজ ঘাসে মাঠ ঢাকা পড়িল কেন? কি বিশাল বিস্তীর্ণ মাঠ। বন হইতে মাঠ ক্রমনিম্ন। জলস্রোত বহিয়া সবুজ

মাঠের মাঝে মাঝে রক্তিম পথ রচনা করিয়াছে। মাঠের শেষে বৃহৎ গাছপালার আড়ালে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খড়ের ঘর। ঐখানে যাইবার সময় আজ আর নাই, সন্ধ্যা আসে প্রায়।

বনের ধার দিয়া বন ঘিরিয়া পথ। বন কাটিবার সময় গরুর গাড়ীর পথ এ, এই পথ ধরিয়া বন প্রদক্ষিণ করিয়া ফিরিতে হইবে। এ পথ না পাইলে আবার বনের ভিতর দিয়া ফেরা ছাড়া উপায় ছিল না।

এ কি নির্জন নিস্তব্ধ প্রদেশ! বিস্তীর্ণ অরণ্য মধ্যে প্রসারিত মাঠে, বন বেষ্টনকারী পথে, কোথাও কোনো পক্ষীর দেখা নাই, সাড়া নাই। এ যেন প্রাণীজগৎ নয়, শব্দহীন নিথর দেশ। নিঃশব্দ বাতাসে শুধু লতাপাতা কাঁপে। বহু দূরে কোন্ অদৃশ্য গ্রামে কুকুরের রব একবার অস্পষ্ট শোনা গেল কি? কিন্তু কোথায় জনপ্রাণী? কোন্ ঘুমন্ত পুরী এ, কিম্বা স্বপ্নদৃষ্ট এক ভয়াবহ জঙ্গল!

দক্ষিণে এই সবুজ ঢালু প্রান্তর—বামে শালবন, মধ্যে বনপথ, বনের ধারে পথের পাশে একটি বৃহৎ া প আঁকাবাঁকাভাবে স্থির হইয়া আছে, হঠাৎ চমকিয়া বনের মধ্যে পলাইল।

বনভূমি প্রদক্ষিণ শেষে দেখা দিল মান্দ্রাজ রেলপথ। এইখানে বহু পথ মিলিয়াছে—কোনোটি গ্রামের দিকে, কোনোটি জঙ্গলের ভিতরে। এ দিকের বন কাটা পড়ে নাই এখনো। ঝোপগুল্মের মধ্যে দাঁড়াইয়া এক কৃষ্ণাঙ্গী সাঁওতাল কন্যা সাদা বনফুলগুচ্ছ ছিঁড়িতেছে।

'কি করবি ফুল?'

অকপট হাস্যে উত্তর হইল—'মাথায় পরবো।'

দেখা গেল বন্দীবাসের চূড়া। এতক্ষণে ফিরিলাম কি? বহুক্ষণ পদব্রজে, ক্লান্তি তেমন কই? এ কি রুক্ষ মাটির গুণ? বাংলার জল-হাওয়ায় শ্রান্তি যেন মেশানো।

নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহর। গ্রীষ্মের তপ্ত দিন। কিন্তু বৃক্ষতলে দাঁড়াও, একটি স্নিগ্ধ বাতাস আসিয়া গায়ে লাগিবে। এক এক দিন জোর বৃষ্টি হয়—জলের স্রোত চলে, ক্ষণেক পরে যে সেই রুক্ষ কঠিন মৃত্তিকা।

একটি অনাজিত অরণ্যের রূপ প্রাঙ্গনসীমায়—আম পেয়ারা বকুল নিম কাঁঠাল মহুয়া ও শাল। বকুলে ও আমে, নিমে ও পেয়ারায় মিশিয়া ঘন কুঞ্জ গড়িয়াছে। কয়েকটি ধানের গাছ দিয়াছে শস্যক্ষেত্রের ঈষৎ ইঙ্গিত, বায়ুভরে দীর্ঘ সবুজ চিক্কণ পাতাগুলি আভূমি নত হইয়া পড়ে। নীচে কোমল ঘাসের বনও বায়ু হিল্লোলিত।

বকুলের নীচে নীচে চলিবার পথ অনিচ্ছায় ফুল পড়ে পায়ের নীচে। জোর বাতাস আসে শালবন হইতে—ঝর ঝর করিয়া বকুল ফুল ঝরিয়া পড়ে। সন্ধ্যায় ঝরে দুটি একটি—ভোরবেলা মাটিতে ফুল বিছানো। সদ্যস্ফুট বকুল ফুলের বৃন্ত শক্ত। কয়েক দণ্ড পরে সেই ফুল শিথিলবৃন্ত, মাটিতে লুটায়। অলস বাতাস দাঁড়াইয়া একটি একটি করিয়া ফুল ছিঁড়িয়া দেখিয়াছ কি? পাকা বকুল ফল খেজুরের মত সুমিষ্ট, দেখিতেও প্রায় খেজুরের মত। কাঁচা বকুল কচি আমের মত। ফুলের পাশে পাশে ফলও মাটিতে ঝরিয়া পড়ে।

কি মোহময় নির্জনতা! চারিদিকে শুধু বন, শুধু প্রান্তর, শুধু বৃক্ষাবলী। উত্তর দিক বর্জন কর সযত্নে, সে পথ তোমার নয়। ঐ দিকে। রীতিমত সংসার—রেল লাইনের ওপারে নিত্য নূতন বাড়ী গড়িয়া উঠিতেছে। ওদিকে আনন্দ কোথায়

পূর্ব পশ্চিম দক্ষিণে এসো—দক্ষিণ, রহস্যময় দক্ষিণ, অপূর্ব তাহার শালবন। ও বনের রহস্য ভেদ করিয়াছি। দেখিয়াছি বনমধ্যে লুক্কায়িত মণিরত্নরাশি। দেখিয়াছি স্বপ্ন-সৌন্দর্য্যময় শ্যাম সবুজ শ্রী।

কিন্তু ঐ মনোমুগ্ধকারী দিবা প্রকৃতির উদাস উদার রূপ রাত্রিতে বড় ভয়ঙ্কর। তুমি নির্জন-প্রয়াসী হও, তথাপি জীবজগতের বিন্দুমাত্র শব্দ তোমার

মন চাইবে না কি ? একাকী বাস কর, কিন্তু কোনো মানব কণ্ঠ অথবা পশু পক্ষীর রব শুনিতে চাও না ? কিন্তু ঐ বন ভেদ করিয়া চল বনের পারে, প্রান্তর পাড়ি দাও, একটি ধ্বনি তোমার কানে আসিবে না, একটি প্রাণী তোমার চোখে পড়িবে না, একটি ডালে নিমেষের জন্য পথ চলার বিঘ্ন ঘটিবে না।

ঐ শালবন, নীল আকাশের গায়ে আঁকা, বাতাসে ঢেউ খেলিতেছে বনে। এলোমেলো ছড়ানো পাতা অসজ্জিত রূপে সুসজ্জিত। আকাশ আনত হইয়া মিশিয়াছে শালবনে, শালবন মিশিয়াছে প্রান্তরে। শালবনের নীচে প্রান্তর—ঊর্ধ্বে আকাশ। আকাশ-পৃথিবীর মিলন রেখা শালবন।

জ্যোৎস্নাদীপ্ত আকাশ তলে কৃষ্ণবর্ণ শালবন।

প্রভাতের আরক্ত দিগন্তে উজ্জ্বল সবুজ শালবন।

বনচর

শালিকে বাসা বাঁধিয়াছে সারি সারি—দিনরাত্রি মাথার উপরে কিচ্ কিচ্। প্রথমে দুইটি শালিক একত্রে উড়িয়া আসে, ঘুরিয়া দেখিয়া দেখিয়া পছন্দ করে, তারপর খড়কুটা আনিয়া বাসা বাঁধে। একটা বাসা না বাঁধিতেই তন্মধ্যে দেখা গেল একটি ডিম—স্থানটি নিরাপদ হইলেও ডিমের পক্ষে উপযুক্ত নহে, সুতরাং ডিমটি সযত্নে তুলিয়া অপর একটা সম্পূর্ণ তৈরি বাসায় রাখা হইল। একটু পরে দুইটি শালিক - নূতন বাসাটি তাদেরি বোধহয়—ডিম দেখিয়া সে কি কোলাহল! "ই-চি-চি—কি-চি-চি!" স্পষ্ট শোনা গেল—'ওরে, আয়রে দেখে যা, আমাদের ঘরে ডিম! কে রাখলে? বিষম গোলমাল বাধাইয়া সমস্ত প্রতিবেশী-কুটুম্ব ডাকিয়া জড় করিল, যাহারা ঐ দুষ্কর্ম করিয়াছে তাদের গ্রাহ্য করিল না আদৌ। পরদিন ডিমটি অদৃশ্য। বোধহয় যাদের ডিম ঘর তৈরি শেষ করিয়া নিজেদের ঘরে নিজ ডিম লইয়া গিয়াছে।

এত ঝগড়া করে শালিক—একদিন বিনা বিবাদে কাটে না। ওরা কি

সেকালের কলহপটু ননদ? পিতৃগৃহেও স্বাধীন, গাছের ডালেও স্বাধীন। ঈশ্বর স্বাধীনতাটি বজায় রাখিয়াছেন। এত তুচ্ছ কারণে ঝগড়া অপর কোন প্রাণীতেই দেখা যায় না।

এক একটা দুষ্ট শালিক পরের ঘরে যায় সঞ্চিত খাদ্য চুরি করিতে অথবা অপর কারণে, অমনি বিষম কলহ! মীমাংসা সভা বসে ঘাসের বনে, বকুল ডালে কিম্বা আম তলায়। বকুলের পাশে শাল গাছে কাকের বাসা। কাকটাও বড় ঝগড়াটে, অকারণ বিবাদ বাধাইবে। শালিক-শিশুকে ঠোকরাইতে আসিয়াছিল, সমস্ত শালিক মিলিয়া কাকটিকে বাসাছাড়া দেশছাড়া করিল প্রায়! সে কি নিদারুণ ঝগড়া! তিনদিন ধরিয়া বিবাদ চলিল,—সন্ধ্যায় বিবাদ চাপা দিয়া ঘরে ফেরে—ভোরে ঘাসের বনে আবার আরম্ভ,—তিন দিন ঝগড়ার পর সমস্ত কাককে কোণ ঠেসা করিয়া শালিক দল নিশ্চিন্ত হইল। এইখানে দেখ কি আশ্চর্য! শালিকের স্বজাতি-প্রেম হয়তো তেমন নাই, কিন্তু বহিঃশত্রুকে পরাস্ত করিতে সকলে একমত।

দারুণ ক্ষুধা শালিক-শিশুর, তখনো বাসা হইতে বাহির হইতে পারে না, পিতামাতা অক্লান্ত আহার যোগায়। একটি বাসায় থাকে সন্তানের পাহারা, অপরটি যায় খাদ্য আনিতে। ঘরে ঘরে শিশু, সুতরাং বিবাদের অবসর আর এখন নাই। শুধু উড়িয়া মাঠে গিয়া পড়ে, মুখে করিয়া খাবার আনিয়া বাচ্চাকে খাওয়ায়। তখনি আবার যায় আবার আনে, কি সর্বগ্রাসী ক্ষুধা বাচ্চাদের,—হাঁ করিয়াই আছে! ঝড়ে বাতাসে বৃষ্টিতে রৌদ্রে অবিশ্রাম খাদ্য আহরণে শালিকদের আর সে তেজ নাই, শ্রী নাই, বুঝি শক্তিও নাই। সূর্যোদয়ের পূর্ব হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত শুধু আহার নিদ্রা বিশ্রাম ভুলিয়া আহার বহন করা! সন্তান কি এত কষ্ট দেয় পিতামাতাকে? বাচ্চাগুলি জন্মিবার আগে উহারা বনে বনে ডালে ডালে মাঠে মাটিতে মনের আনন্দে বেড়াইয়া ফিরিত, কি জোরের সঙ্গে বিবাদ জুড়িত, কত উৎসাহ কত উদ্যম কত না শক্তি ছিল তখন। আর এখন? সন্তানের রাক্ষসী ক্ষুধা মিটাইতে নিজেদের কুলায় না।

পক্ষীনীতি কিঞ্চিৎ উল্টা। কাক চিলকে তাড়াইয়া বেড়ায়,—শালিকের ভয়ে কাক তটস্থ,—চড়াই পাখী শালিককে দেয় আক্কেল! ছোটর কাছে বড় জব্দ!

শালিক-শিশু ক্রমে উড়িতে শিখিয়াছে। মায়ের সঙ্গে মাঠে চরে। মা যে খাবারটি ধরে, তখনি হাঁ করিয়া ছুটিয়া যায়। মা নিজের মুখের প্রতি গ্রাসটি শিশুকে দেয়।

আরো বড় হইল শিশুরা—স্বচ্ছন্দ ভাবে উড়িতে চরিতে পারে। অনেক আত্মীয় কুটুম্বের সহিত বেশ আলাপ জমিয়া গিয়াছে, ঘাসের বনে নানা দিকে নানারূপ সভা—কোথাও বাপ মা একদিকে শান্তভাবে সন্তানকে পর্যবেক্ষণ করিতেছে, কোথাও চড়াই পাখীর মেলা। একদিকে কাক বিদ্বেষ ভরে শালিক বাচ্চাকে লক্ষ্য করিতেছিল। বাচ্চাগুলি পরম উৎসাহে সমস্ত বন জুড়িয়া বিচরণ-রত, কত আলাপ, কত কাকলী, কত না আনন্দ! তারপর একদিন সঙ্গীদলের সঙ্গে কোথায় উড়িয়া চলিয়া গেল।

মা বাপ একা—বিষণ্ণ নিরুৎসাহ। কিন্তু এই ভাল! এবার ওরা সুখে থাকিবে। নিজেদের দিকে ফিরিয়া দেখিবে এবার।

বনের হাওয়া

উজ্জ্বল রৌদ্র—উজ্জ্বল নীলাকাশ। অলস বাতাস তরুলতা তৃণ জঙ্গল ঝোপ গুল্ম দুলিতেছে। মৃদু বায়ু নহে, জোর বাতাস। উদাস ও স্নিগ্ধ অলস সে হাওয়ায় তন্দ্রার ঘোর আনে। আমি যেন একখানি মেঘ নীল আকাশে ভাসিয়া উড়িতেছি।

রাশি রাশি লজ্জাবতী লতা প্রান্তরে ঘাসের বনে। লজ্জা যেন একটু কম। যে দেশে মেয়েরা রাখালী করে, একা হাটে আসে, তিন চার মাইল দূর হইতে শালবন পার হয়, সন্ধ্যার আঁধারে জঙ্গল হইতে ফুল পাতা ছেঁড়ে, সে দেশে বঙ্গের সরমকুণ্ঠিত ভীরুভাব লতায় থাকিবে কেন?

মুক্তা ঝলমল করে ঘাসের বনে, কোন্ মুক্তা? তৃণদলের শ্বেত গোলাপী মুক্তা। উষার অন্ধকারে বকুল ফুল খুঁজিয়া বেড়াই, বকুল ফুল খুঁজি সন্ধ্যার আঁধারে। সন্ধ্যায় যে ফুল ঝরিয়া পড়ে, প্রভাতে তাহাদের কিনারা ঈষৎ লাল দেখায়। সদ্য ঝরা বকুল ফুল তারার মত শুভ্র সতেজ।

শালবৃক্ষটির বাকল একটু উঠিয়া গিয়াছে। শালবৃক্ষের প্রকৃত বর্ণ রক্ত-চন্দনের ন্যায়।

তারার মত শ্বেত প্রজাপতি মাটিতে ঝরা বকুলের উপর উড়িয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে—অলস বাতাস, তাহাদের গতি আনন্দ-অলস। প্রান্তরে কিশোর বয়সী রাখাল রাখালী বাঁশের কঞ্চি ভাঙিয়া তীর ধনুক বানাইয়া শর-চালনা শিক্ষা করিতেছে। প্রান্তরে দু'চারিটি বকুল গাছ থাকিত যদি ফুল কুড়াইয়া উহারা মালা গাঁথিত।

পুষ্পসুগন্ধি বায়ু স্বেচ্ছাসুখে বহিতেছে। বকুলবনে পত্র পল্লবের আড়ালে মৌমাছি নিঃশব্দে ফুলে ফুলে সঞ্চরণ-নিরত। ভূপতিত ফুল কি মধুহীন? মাটিতে ঝরা ফুলে মৌমাছি দেখিতে পাও কি?

বনপ্রান্তে—দূরে

ঘোর নির্জন প্রদেশে লেভেল ক্রসিং—ইহার বহুদূর পশ্চিমে বন্দীবাস।

একদিকে ঘন শালবন, অন্যদিকে বিস্তৃত তৃণক্ষেত্র, মধ্যে পুরী রেল লাইন। লাইনের ওপারেই লেভেল ক্রসিং।

কি সুবিস্তীর্ণ মাঠ—কি সুকোমল ঘাসে ঢাকা, কি উজ্জ্বল সবুজ বর্ণ। ঘাসের এই ঢালু মাঠের পরে ধান ক্ষেত। লাইনের ধারে লাইনম্যানের ক্ষুদ্র ঘরটি। বাপ ও ছেলে থাকে এখানে, আর সব দেশে। ঘরে খাটিয়া বিছানা—বারান্দায় উনান। শান্ত নিরীহ লোকটি। ভয় করে না তোমার?

অন্ন সংস্থানের জন্য এই নির্জনবাস। ব্যাঘ্রভীতি আছে কি এখানে?

কোনো দিকে লোকাবাসের চিহ্নমাত্র নাই। আধ পয়সার জিনিস মিলিবে না—আসিতে হইবে বন্দীবাসের পশ্চাতে হিজলী বাজারে।

লাইনের এপারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সবুজ মাঠে অসংখ্য গুল্ম ঝোপ—মূল হইতে পত্রবৃন্ত পর্যন্ত ঘোর রক্তবর্ণ। রৌদ্র বৃষ্টি সহনীয় ঘনকৃষ্ণ ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রস্তর পড়িয়া আছে, অরণ্য রাজ্যের অপূর্ব শিলাসন।

এই লাইন পার হইয়া ক্রসিং ছাড়াইয়া চল, চল বিনপুরা স্টেশনের ওপারে, জঙ্গল ভেদ করিয়া মাঠ পার হইয়া চল, জলাশয়ের ধারে ধারে গাছের তলায় তলায় কর্ষিত ক্ষেত্র মধ্য দিয়া প্রান্তর ঘিরিয়া যাত্রা কর দিগন্ত ভ্রমণে। কোনো বাধা মানিও না, নির্ভীক পথিক! কাকে তোমার ভয়? অকুতোভয়ে হে বনবাসী, চল আরো দূরে, আরো দূরান্তরে—যতদূর দৃষ্টি চলে। যতদিন না তোমার নিজ নির্বাচিত বাসগৃহ না মিলে।

কে তুমি? কি তোমাব উদ্দেশ্য? কোথায় তোমার পথ? কি তোমার মূল্য? তুমি কি চিনিতে পারিয়াছ তোমাকে? পার যদি সন্ধান দাও—শিক্ষা দাও—যে শিক্ষায় অন্ধ অন্তর-নয়নের মুদ্রিত পল্লব খুলিয়া যায়।

কোন আশায় যোগী সন্ন্যাসীর প্রাণান্ত তপস্যা? কিন্তু যোগীর নিভৃত হৃদয়কন্দরে বাস করে বিলাসী—প্রতি বিলাসীর চিত্তে বাস করে একটি যোগী। এবং আপনার অন্তরবার্তা আপনি জানে না। তথাপি—

বংশী বাজিল ঐ বিপিনে
(আমার তো না গেলে নয়)
তোরা যাবি কিনা বল্‌গো
তোদের কথার কথা
আমার অন্তর ব্যথা।
তোদের বাঁশী বাজে কানের কাছে
আমার বাজে হৃদয়-মাঝে।

সৌধশির হইতে গর্বিত চাহনি হাসিও না বনের দিকে, বাঁতায়ন হইতে

অলস দৃষ্টিতে বন চাহিয়া দেখিও না, অসম্মান করিও না বনানীর। গৃহ ছাড়িয়া মৃত্তিকায় নামিয়া এসো। বনপ্রান্তে অথবা প্রান্তরে দাঁড়াও অরণ্যের প্রকৃতরূপ বুঝিতে চাও যদি। এসো নিস্তব্ধ শান্ত উষায় যখন কর্মচাঞ্চল্য জাগে নাই পৃথিবীতে, এসো নির্জন দ্বিপ্রহরে—জাগ্রত জগতের কোলাহল যখন ক্ষণেকের জন্য নিবৃত্ত হয়। এসো শান্ত সন্ধ্যাকালে, পরিশ্রান্ত প্রাণীকুল যখন দিবাবসানে নিজ নীড়ের জন্য ব্যাকুল হয়। ক্লান্তদেহে চাঞ্চল্য নাই, শ্রান্তিভরে বাক্‌শক্তি নীরব, চাঞ্চল্য শুধু অন্তরে। ধাবমান পদ, ধাবমান চিত্ত, কিন্তু কুজন-শক্তিহীন। প্রভাত কাকলীর মত উৎসাহ উদ্দীপনা নাই। বিশ্রাম আশায় উদগ্রীব। সন্ধ্যায় কোলাহল নাই। সন্ধ্যা শান্ত।

আর একবার এসো গভীর রাত্রে স্নিগ্ধ নৈশবায়ু প্রবাহ বেষ্টনীতে, শুক্ল পক্ষের জ্যোৎস্নাতলে, অথবা ঘোর অমানিশায়। যখন চরাচর শব্দহীন বিশ্রামরত। সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে প্রান্তরে দাঁড়াও। কান পাতিয়া শোন বিশ্ববীণার চিরন্তনী সুরঝঙ্কার, অনাদি অনন্তকাল হইতে দ্যুলোক ব্যাপিয়া যে সুর বাজিতেছে, অন্তর ভরিয়া শোন সেই অনাহত অশ্রুত রাগিণী।

বনের পর্ব

হে পথচারী, তপ্ত মধ্যাহ্ন-শ্রান্তিভার জুড়াইতে তৃণাসনে বসিয়াছ কি? এই উজ্জ্বল সবুজ কোমল-কোমল তৃণারণ্য—শ্বেত পীত নীল লোহিত পুষ্প মণি খচিত অপরূপ তৃণারণ্যে বসিয়া বৃহৎ শাল তরুমূলে দেহভার রাখিয়া ঊর্ধ্বে দৃষ্টিপাত কর—রাজহংসবৎ শুভ্রকান্তি লঘু মেঘভার শোভিত অনন্ত নীলাকাশ—বিশাল নীল জলাশয়ে সুখবিহারী রাজহংসের ন্যায় মন্দ গতিশালী মেঘপুঞ্জ। সমগ্র অরণ্যভূমি চঞ্চল করিয়া স্বেচ্ছাসুখে বাতাস বহিতেছে। সেই বনানী-স্নিগ্ধ চঞ্চল বায়ুভরে অলস তন্দ্রার জাল আপনি নেত্রপল্লবে নামিয়া আসে।

আহা পথচারী,—এমন মধুর দিবাস্বপ্নময় দ্বিপ্রহর নৈদাঘ ঋতু ভিন্ন কোথায় মিলিবে? উজ্জ্বলকান্তি উদাসীন গ্রীষ্ম ভিন্ন?

বর্ষ চক্রের আবর্তনে যখন ঘোরকৃষ্ণ মেঘজালে গগনপট আবৃত করিয়া বর্ষাধারা ঝরিবে, এই তৃণাসনে তখন বহিবে প্রবল স্রোত। শরৎ প্রভাতে শিশির মণ্ডিত শ্বেতাভ তৃণাসনের মুক্তাজাল ঈষৎ দূরে দাঁড়াইয়া চাহিয়া দেখিও। হেমন্তে কুয়াসাচ্ছন্ন তৃণারণ্যের এই শোভন রূপ থাকিবে কি?

সর্বশেষে দুর্দান্ত শীত,—ঘোর কুজ্ঝটিকায় আকাশ পৃথিবী ঢাকা পড়িবে—হিমপ্রহারসঙ্কুচিত হিংস্র প্রাণী লুকাইবে বিবরে,—তখন দিবসে রবিকর নিষ্প্রভ, নিশায় নক্ষত্র নিষ্প্রভ, সর্বত্র শুধু তুষার কুয়াসার রাজত্ব।

কিন্তু সেই দুরন্ত শীতের হিম পৌষ প্রত্যূষ অরণ্য পূজার সময়।

হে উদাসীন! তুমি কি দেখিয়াছ ভারতবর্ষের গম্ভীর-রূপ-নিবিড়-ঘোর-শ্যাম বনানী মধ্যে ভারতবর্ষীয় কুমারীগণের অরণ্য পূজা? ম্রিয়মান বনরাজের নব আনন্দ উপহার লাভের দিন? বন দেবতার অর্চনার সে সমারোহ?

কুয়াসাবৃত নিস্তব্ধ অরণ্য মধ্যে এক প্রত্যূষে অকস্মাৎ ব্রতধারিণী কুমারী-কুলের আবির্ভাব ঘটিবে। কেহ মৃণাল বাহু ঊর্ধ্বে তুলিয়া স্খলিত-শুষ্ক-পক্ক-জীর্ণ-পত্র পল্লবরাশি বৃক্ষশাখা হইতে মোচন করিয়া ফেলিবে। কেহ বনভূমি ও বৃক্ষতল স্বহস্তে মার্জনা করিবে—শুষ্ক বনকাষ্ঠ, শুষ্ক লতা, শুষ্ক তৃণ আহরণ করিয়া স্তূপাকার করিবে। নূতন মৃত্তিকা পাত্র ভরিয়া রন্ধনের উপকরণ সাজাইবে—সতেজ বৃহৎ বৃক্ষপত্রে বনজাত শাক ফল মূল অভিনিবেশ সহকারে স্তরে স্তরে বিন্যস্ত করিবে।

ধীরে ধীরে কুয়াসা জাল ছিন্ন করিয়া লোহিত রবিকিরণ সমগ্র বনানী ব্যাপিয়া ছড়াইয়া পড়িবে। আশ্চর্য বিস্ময়ে দেখিও তখন নির্ম্মল মধুরকান্তি কুমারী অনিন্দনীয়া স্নানান্তপট্টবাসা এলায়িতকৃষ্ণকেশভার—অঞ্চলখানি দেহে জড়াইয়া বনপুষ্পচয়ণ নিরতা।

দেখিবে সযত্নগ্রথিত বনফুল মালা কাণ্ডে কাণ্ডে শাখায় শাখায়

দুলিতেছে। তরুমূলে পত্র পাত্রে অজস্র পুষ্প নৈবেদ্য, পুষ্পার্ঘ্য, বৃহৎ ফুলের ঝাড়, সে ঝাড়ে পুষ্প পত্রপল্লব মঞ্জরী যুক্ত।

পূজা শেষে গলায় আঁচল জড়াইয়া জানু পাতিয়া ভক্তিনতললাট কুমারী যুক্তকরে বনস্পতিকে নিমন্ত্রণ করিবে, নিমন্ত্রণ শেষে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া উঠিবে যখন শুক্লাপঞ্চমীর চাঁদের মত সে উজ্জ্বল স্নিগ্ধ ললাট তিলকাঙ্কনের ন্যায়, তরুতল ধূলিরেখা চিত্রিত।

সে দিন অরণ্য ব্যাপিয়া এক জাগ্রত চাঞ্চল্য,—ঊষায় নীড়ত্যাগী বনচর খাদ্য আহরণে দূরে যায় নাই। শাখায় শাখায় আনন্দ কলরবে বনানী মুখর করিয়া তুলিয়াছে,—তাহারাও নিমন্ত্রিত এবং সমাদর সম্পন্ন সঙ্গী।

ধীরে ধীরে সূর্য উঠিবে মধ্য গগনে, প্রজ্জ্বলিত ইন্ধনধূম পবিত্র যজ্ঞ ধূমের ন্যায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়া বায়ুভরে বায়ুমণ্ডলে ছড়াইয়া পড়িবে। অলসগতি পুষ্পবাসমদির বায়ু বার বার কর্মনিমগ্না কুমারীর মুক্তকেশ পট্ট-অঞ্চল চঞ্চল করিয়া দিবে।

সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন হইবে ঠিক দ্বিপ্রহরে। প্রথমে বনদেবের পূজা। অরণ্যের মধ্যস্থানে যজ্ঞস্থলে সকলে মণ্ডলাকারে ঘেরিয়া বনদেবকে অর্ঘ্য পূজা নৈবেদ্য এবং ভোগ নিবেদন করিবে। সরস বৃহৎ কদলীপত্রে ঘৃতসুগন্ধি নূতন আতপ তণ্ডুলের খেচরান্ন—বিবিধ বৈচিত্র্যে পক্ক বিবিধ শাক—খর্জুর রস মিশ্রিত পরমান্ন—সুবাসে দিক আমোদিত। সে সজ্জানৈপুণ্য অপূর্ব,—উজ্জ্বল কোমল সবুজ পাত্রে, পীতাভ খেচরান্ন, ভর্জিত রন্ধিত গাঢ় সবুজবর্ণ খেঁসারী কলাই, মটর শাক—স্বর্ণাভ পরমান্ন,—নূতন লোহিতাভ মৃৎপাত্রে স্বচ্ছ সুবাসিত পানীয়। ঈষৎ হরিতাভ অতি নবীন কদলীপত্রে ঘোর সবুজবর্ণ সজ্জিত তাম্বুলরাশি। অপর পার্শ্বেও তেমনি সারি সারি কদলীপত্রে শুভ্র লোহিত পুষ্পভার—স্তূপাকারে সজ্জিত গাঁদা ফুল—শতমুখী গাঁদা, রক্তপীত গাঁদা, বহু বর্ণের বহু আকারের গাঁদা—সরিষা ফুল—মটর ফুল শস্যক্ষেত্র অথবা বন। সমস্ত পুষ্পবৃক্ষ নিঃশেষপ্রায় করিয়া সমস্ত ফুল আনিয়া বনরাজের চরণে অঞ্জলি দিয়াছে।

২

তারপরে দেখিবে সমগ্র বনভূমি ব্যাপিয়া পরিবেশন-নিরতা কুমারী—প্রতি তরুতলে পত্রপাত্রে খাদ্য পানীয় তাম্বুল পুষ্প তেমনি করিয়া নিবেদন করিয়া প্রণাম করিতেছে।

তেমনি ভাবে বনমধ্যে স্থানে স্থানে পত্রে পত্রে পক্ষীকুলকে আহার্য দিয়াছে, বনপ্রান্তে দূরে দূরে শৃগাল এবং অপর আরণ্য প্রাণীর খাদ্য পানীয় সযত্নে রাখিয়া আসিবে। বনস্থলীর পত্র-পল্লবের ফাঁকে ফাঁকে নন্দনবাসিনী দেবকন্যাতুল্য কুমারীদের স্নিগ্ধ লাবণ্যমণ্ডিত মুখশ্রী এবং শীতপবনকম্পিত অঞ্চলাগ্র বার বার তোমার নয়ন পথে পড়িবে।

তোমাকেও তেমনি সমাদর করিয়া নিমন্ত্রণ করিবে—সযত্নে আহার্য পানীয় দান করিবে—সে দিন তুমি তাহাদের একমাত্র মানব অতিথি, সুমধুর বাক্যসুধায় তোমার সমস্ত শ্রান্তি জুড়াইয়া দিবে।

পরিশেষে সূর্যাস্তকালে সর্বকর্ম সমাপ্ত করিয়া যুক্তকরে বনদেবের নিকট ক্ষমা চাহিয়া বিদায় লইবে এবং শ্রদ্ধানত শিরে ধীর পদক্ষেপে বনভূমি ছাড়িয়া গৃহে ফিরিবে।

যদি শীত প্রভাতের এই অপূর্ব বন-উৎসব না দেখিয়া থাক তবে একদিন অকস্মাৎ শুভাগমন করিও। যে উন্নতশির তরুমূলে প্রথম রৌদ্র পতিত হয়, সেই সুখোষ্ণ তৃণাসনে আসন গ্রহণ করিও। বনপ্রান্তে বসিয়া বনমধ্যে দৃষ্টি প্রেরণ করিও, সেই পথেই তাহারা বনে প্রবেশ করিবে। ধীরে ধীরে রৌদ্র প্রখর হইতে থাকিবে, ধীরে ধীরে তোমার হিমক্লান্তি দূর হইবে,—তারপরে মিলিবে পাদ্য অর্ঘ্য আমন্ত্রণ;—হে উদাসীন!—নয়ন সার্থক করিয়া স্বর্গীয় শান্তি লাভ করিও।

মেঘ অভিযান দেখিয়াছ?

গ্রীষ্মের শেষে বর্ষার আগে দিনের বিষম উত্তাপ মন্দ হইয়া আসে, যখন গভীর রাত্রির শীতল বাতাস,—সুষুপ্ত স্থির পৃথিবীর উপরে কৃষ্ণপক্ষের ক্ষীণ

চাঁদ উঠিয়া স্নিগ্ধ জ্যোতি ছড়াইতে ছড়াইতে ভাসিয়া চলে ধীরে—অতি ধীরে,—তখন নিকষকৃষ্ণ লঘু মেঘজাল মন্দ গতিতে দক্ষিণ হইতে উত্তরে অভিযান করিয়াছে। ঐ ঘনকৃষ্ণ মেঘ-অভিসার বৃষ্টির সঙ্কেত। ভৌম কার্যের বিধি নির্দেশ অন্তরীক্ষে।

মহা শূন্য নীল মায়াপটে চন্দ্রের সমান ঊর্ধ্বে শুভ্র মেঘখণ্ড অচঞ্চল,—আর জ্যোতিষ্মান তারকাপুঞ্জ নিম্নে কৃষ্ণ মেঘের যাত্রা দেখিতেছে।

চন্দ্র তারা হইতে বহু নিম্নে পৃথিবীর উপরে ঈষৎ কম্পিতশির অচঞ্চল বৃক্ষ প্রায় স্পর্শ করিয়া একে একে মেঘজাল ভাসিয়া চলিয়াছে,—পুঞ্জ পুঞ্জ নহে, নিবিড় নিশ্ছিদ্র নহে, বৃহৎ, অতি বৃহৎ নহে, অতি লঘু স্নিগ্ধদর্শন ঘোর কৃষ্ণ মেঘজাল অলস গতিভরে একে একে দলে দলে উত্তরে চলিয়াছে।—দক্ষিণ সমুদ্রে উহার উদ্ভব, গতি পৃথিবী জুড়িয়া, - যাত্রা হিমালয় অভিমুখে।

কদাচিৎ একখণ্ড শুভ্র মেঘ বুঝি পথ ভুলিয়া অথবা মুগ্ধ হইয়া নামিয়া কৃষ্ণ মেঘের সহিত ভাসিয়া চলিয়াছে।—চাঁদের নীচে দিয়া যাইবার বেলা নিমেষের জন্য উজ্জ্বল সুবর্ণ রঞ্জিত হইয়া উঠিল। বার বার কৃষ্ণ মেঘের স্বচ্ছ জালের ছায়া পড়ে চাঁদের উপর।

দৃশ্য অন্যরূপ

অতি শুভ্র লঘু মেঘজাল আকাশের গায়ে সংলগ্ন হইয়া আছে—সর্বত্র ব্যস্ত নহে—স্থানে স্থানে। সহসা ভ্রম হয় বুঝি দীপ্তিময় ছায়াপথ।

সমস্ত রাত্রি ভরিয়া মেঘের অভিসার-লীলা চলিবে নানা রূপে, নানা ভাবে—রাত্রে বর্ণবৈচিত্র্য নাই। শুধু শ্বেত, ধূসর, কৃষ্ণ—এই ত্রিবর্ণের লীলা। কখনো ধূম্র ধূসর রূপে দিগন্ত ঢাকিবে—কখনো নির্মেঘ আকাশে মুহুর্মুহু বিজলী খেলিবে,—নানারূপে নানা আকারে জীবজন্তু দ্বীপ, পথ, পর্বত, অরণ্য, আকাশের গায়ে অবিরত ফুটিবে আর মিশিবে—মিশিবে রাত্রির অন্ধকারে—মিশিবে মহাশূন্যে। তারপরে দিনে দিনে ধীরে ধীরে লীলার শেষ

হইয়া যেদিন পূর্ব-উত্তর কোণ হইতে পশ্চিম-উত্তর কোণ পর্যন্ত সমগ্র উত্তরাকাশ জুড়িয়া কজ্জল কৃষ্ণাভ নিবিড় নিশ্ছিদ্র মেঘের বিরাট প্রাচীর পড়িবে—সেই মূহুর্তে বৃষ্টি।

বর্ষা ভিন্ন বৎসরের যে কোন ঋতুতে যে কোন সময়ে যখন দেখিবে সহসা নির্মেঘ আকাশে অথবা শুভ্র মেঘের সঙ্গে কোনো মেঘ দেখা দিয়াছে, কখনো আকাশ-সংলগ্ন, স্থির; কখনো চঞ্চল—কদাচ বা অতি দ্রুত উড়িয়া বেড়ায়—খণ্ডে খণ্ডে কিংবা বৃহৎ আকারে সমস্ত আকাশে যাতায়াত আরম্ভ করিয়া দিয়াছে,—ক্ষুদ্র চন্দ্রমণ্ডল ক্রমে বৃহৎ হইতে হইতে বেষ্টনীর মধ্যে তারা জ্বলে, তখনই বৃষ্টি আসন্ন। দারুণ গ্রীষ্মে যখন বারিবিন্দুর আশায় ঊর্ধ্বমুখ—সেই সময় রাত্রিকালের আকাশ নীরবে দর্শন করিও—নিসর্গ তত্ত্ব অধ্যয়ন শেষ হইলে আর অনিশ্চিত আশায় উৎকণ্ঠ থাকিবে না। দেখিবে শ্বেত পর্বত ঢাকা পড়ে কালো জালে,—শ্বেত মেঘের উপর দিয়া চঞ্চল কালো মেঘ দ্রুত গতিতে উড়িয়া যায়—তাহারি ভিতর দিয়া দেখা যায় সুন্দর স্বর্গীয় স্বপ্নের মত চন্দ্রালোক স্নিগ্ধ নীল আকাশ।

চাঁদও তখন ক্রীড়াচপল, দিব্য স্থির হইয়া কিরণ বিকীর্ণ করিতেছে। সহসা চলন্ত কালোমেঘের সঙ্গে দ্রুত ছুটিয়া চলিল,—এই বুঝি অদৃশ্য হইল, না যেমন সে তেমনি আছে।

কিংবা দক্ষিণ দিকপ্রান্ত হইতে শ্বেত সমুদ্রের মত তরঙ্গিত শ্বেত মেঘ-প্রাচীর আকাশ জুড়িয়া ঢেউ খেলিতে খেলিতে অতি মৃদু কচ্ছপ-গতিতে উঠিয়া ধীরে ধীরে আকাশ ঢাকিয়া ফেলে,—কয়েক মুহূর্ত পরে আর চিহ্ন মাত্র নাই, আবার সেই নির্মেঘ নভোমণ্ডল। আবার খণ্ড খণ্ড শুভ্র মেঘের উপরে কালো ছায়া পড়ে,—তারপরে আরও গভীর রাত্রে সমস্ত আকাশ জুড়িয়া এক ঘোর ধূসর যবনিকা, যবনিকা যেন এখনি উঠিবে, ঐ বুঝি কাঁপিতেছে। কিন্তু যবনিকার চারিদিকের দিগন্ত উন্মুক্ত শুভ্র।

বনের বর্ষা

কুসুমে তোমার কান্তি—
সলিলে তোমার শান্তি—
বজ্র রবে রুদ্র তুমি ভীম।

নব বর্ষা, বড় অকালে আরম্ভ হইল বর্ষা! ঘনকৃষ্ণ মেঘ আকাশ ঢাকা দিয়াছে,—নিরন্ধ্র নিবিড় মেঘ—স্তরে স্তরে সমস্ত আকাশময় বিস্তৃত। সেই মেঘ চিরিয়া বিদ্যুৎ জ্বলিয়া উঠিতেছে। শোঁ শোঁ শব্দে ভীষণ ঝড় উঠিল—ঝড় পরিণত হইল উদ্দাম বাতাসে, শেষে মূষলধারা বর্ষণ। বহুদূর হইতে ধূসর শ্বেতজালে সমস্ত তরুশ্রেণী, শালবন ঢাকিয়া বৃষ্টি আসিতেছে—উপরের মেঘের ঘন কালোছায়া পড়িয়াছে পৃথিবীতে, মেঘ হইতে নামিল বৃষ্টি—ধূসরজালে বনানী ঢাকা পড়িল—শালবন ঢাকা পড়ে পড়ে—অস্পষ্ট হইয়া উঠিল প্রায়, মুহূর্ত মধ্যে মাঠের উপর মূষলধারা নামিয়া পড়িল। কখনো সে জলধারা সোজা, কখনো বাঁকা। বকুলফুলের রাশি দলিত কর্দমাক্ত।

* * * *

—বর্ষা?—ভয় কি? যে আদরে গ্রহণ কর হিমপাত জ্যোছনা, রৌদ্র, তেমনি করিয়া গ্রহণ কর বর্ষাধারা। প্রসারিত পথ নীরবে অপেক্ষায় রহিয়াছে, স্বাধীন গতি বন্ধ করিবে বৃষ্টি ভয়ে? দ্বিধা কেন পথিক? পথের সুবিধা অসুবিধা দুই তুমি সমান আদরে বরণ করিয়া নাও। পলায়ন করিও না।

ঐ যে পথের দুইধারে ছোট বড় পরিত্যক্ত টিনের চালা, বৃষ্টি হইতে বাঁচিতে পার—কিন্তু পথে বাহির হইয়া লইবে ঘরের আশ্রয়? পলাইবে কেন? একটা বকুলতলায় দাঁড়াইয়াছি, গাছটা ছোট, মাথাটি ভিজিল না, শুধু সর্বাঙ্গে বর্ষণ নামিল। এখন মাঠের পথে ও শালবনে যাওয়া যায় না, জল এবং কাদা। উত্তরের কঙ্কর বিছানো উচ্চ বাঁধানো পথটি ছাড়া অন্য পথে চলিবার সুবিধা

নাই। দুইদিকে সুউচ্চ তরুশ্রেণী, ঝাউবন বাতাস লাগিয়া শন্ শন্ করিতেছে। কোথাও দুইদিকের ডালপালা হেলিয়া মিশিয়া মাথার উপর পাতার চাঁদোয়া।

সেখানে বৃষ্টি গায়ে পড়ে না তেমন। প্রত্যেকটা গাছ নূতন পাতা, নূতন মঞ্জরী ও নূতন মুকুলে ভূষিত। গুচ্ছ গুচ্ছ রক্ত কিশলয়ে সজ্জিত বৃক্ষশ্রেণী। প্রতি বছর বসন্ত হইতে সারা বর্ষা তরুলতার নবীন সজ্জার সময়। পুরাতন জীর্ণ বেশ ছাড়িয়া তাহারা তরুণ ও সতেজ রূপ ধরে। মানুষের কই অমন হয় না? বছর বছর কি চুল ঝরিয়া নূতন চুল ওঠে? না। প্রাণী-জগৎ ক্রমশঃ প্রাচীন হইতে থাকে। কিন্তু উদ্ভিদ জগতে জরা-ব্যাধি নাই।

আবার বৃষ্টি আসিল। ঝাউতলায় দাঁড়াইয়া অপেক্ষায় রহিয়াছি। কঙ্কর বাঁধানো উঁচু পথেও সবেগে জলস্রোত ছুটিয়াছে। বর্ষার বন্য উল্লাসের অপূর্ব স্বরধ্বনি! সহস্র শব্দ-গুঞ্জনে পৃথিবীতে নৃত্য করিতেছে।

শালবনের পথে

মাঠের জল শুকাইয়াছে। কোথাও কোথাও মাটি নরম ও কর্দমাক্ত। সমস্ত মাঠ চোরকাঁটা ভরা। পরিপক্ক দীর্ঘ দীর্ঘ কাঁটাগুলি এখন আর সবুজ নয়। পাটকিলে রং ধরিয়াছে। ঘাসে ও চোরকাঁটায় পথ প্রায় ঢাকা। শালবন যেমন সতেজ তেমনি সবুজ, ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিতেছে।

কি সুন্দর দৃশ্য! একটা বাদামী রঙের খরগোস নাচিতেছে, কান দুটি খাড়া, খরগোসটিও সোজা খাড়া, কি আনন্দিত নৃত্যভঙ্গী! হাত পাঁচেক দূরে দু'দিকে দুটি শিয়াল, কৈ ধরে না ত' খরগোসকে, না—নাচ দেখিয়া ভুলিয়া গেল? সবুজ বনের কোলে এতটুকু পাটকিলে খরগোসটি। মানুষের দেখা পাইয়া বিদ্যুৎবেগে পলাইল বনের মধ্যে। শিয়াল দুটিও অন্যদিকে ছুটিতেছে। বড় চঞ্চল শিয়াল, ভাল করিয়া দেখিতে দেয় না।

শালবনের মধ্যে কিছু দূর পর্যন্ত পাতি পাতি করিয়া খুঁজিলাম, খরগোস

কি শিয়ালের চিহ্নমাত্র নাই, তাদের বাসগৃহের আভাসও মিলিল না। ক্ষুণ্ণচিত্তে ফিরিয়া পূর্ব হইতে পশ্চিম পর্যন্ত যে পথ শালবন ঘেঁসিয়া গিয়াছে সেই পথে পশ্চিম মুখে চলিলাম। বনমধ্যে যেসব আমূল কর্তিত কাণ্ড গুচ্ছ গুচ্ছ নব কিশলয়ে ঢাকা পড়িয়াছিল—তাহার কোন কোনটায় ফল ধরিয়াছে, গাছ কাটিয়া ফেলিবার তিন চার বৎসর পরে ফল ধরে। নূতন পাতা রাশি রাশি—নূতন কিশলয়, মুকুল ও ফল অপূর্ব দৃশ্য। মূল প্রাচীন, বৃক্ষ নবীন। কত জাম, কত কুল লেবু।

পথ ঘুরিয়া আবার উত্তরের পথে আসিয়া মিশিয়াছে! উত্তরে মানবরচিত পথ ও বৃক্ষশ্রেণী—কি মুগ্ধকরী শক্তি আছে তার! বনের অসজ্জিত অসীম রূপের মনোহারিত্ব কি ওই বাঁধানো পথে মিলিবে? শালবনের কিনারা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া যে অনন্ত রূপের আভাস পাই, ওখানে সে কোথা?

সন্ধ্যায় বনের ছায়া প্রায় কালো হইয়া আসিল। উত্তর দিকের হাট হইতে একটি বালক আসিয়া আমাদের পথ ধরিয়া চলিতেছে, শালবনের ভিতর দিয়া ওপারে তার ঘর, বোধ হয় সেই ক্ষুদ্র কুটীরগুলির কোনটি। এই ঘন সন্ধ্যায় জনহীন নিবিড় বনের ভিতর দিয়া সে যাইবে একা। ধীরে ধীরে সন্ধ্যার আঁধারকৃষ্ণ সবুজ বনের মধ্যে কালো ছেলেটি মিলাইয়া গেল।

কত দূর দূরান্তর হইতে হাটে আসে ওরা—রেললাইনের ওপারে হাট। এই পথে উহাদের সঙ্গে দেখা হয় আমার—গামছা বাঁধা ছোট ছোট পুঁটুলি,—হাতে কেরাসিন ও সরিষা তেলের ছোট বোতল ও শিশি। সপ্তাহের সওদা লইয়া যায়। ওদের আলো নাই—সঙ্গীত নাই তেমন।—কদাচিৎ দু চার জন একত্র যায় আসে। বেশির ভাগ দেখি একা।—বাড়ি পৌঁছতে এক প্রহর রাত্রি বহিয়া যাইবে। পথ এই বনের মধ্যে। 'বনদেবতা উহাদের রক্ষক।—

রাত্রির অন্ধকার ছায়ায় ক্রমশঃ সীমান্তরক্ষী নকুল গণ্ডার বানর অশ্ব, মৎস্য হংসরাজ এবং প্রান্তরের সৈনিক ও ঐরাবত ধীরে ধীরে মিশিয়া যাইতেছে।

আবার বৃষ্টি—আবার বন্যা,—বন্যাধারায় চারিদিক ভাসিয়া গেল। কল কল শব্দে সমস্ত মাঠের জল পড়িতেছে পুষ্করিণীতে, পুষ্করিণী ছাপাইয়া জলধারা প্রবল বেগে নীচু পথ ধরিয়া ছুটিতেছে। সব চেয়ে উঁচু শালবন—তার চেয়ে নীচু মাঠ—মাঠের জল আসিয়া পড়ে পথের ধারের নীচু জমিতে—যেখান হইতে রেললাইনের ধারে ধারে। সর্বত্র জল ও কাদা। বনপথগুলি পিচ্ছিল। মূহুর্মুহু বৃষ্টি,—সময় নাই—কোন নিশানা নাই,—এই উজ্জ্বল রোদ—এই ভীষণ বৃষ্টি। বর্ষা প্রায় শেষ—তবুতো বৃষ্টির বিরাম নাই।—কিন্তু সমগ্র বনানী মাথা পাতিয়া সাদরে এই অশ্রান্ত ধারা-বর্ষণ গ্রহণ করিতেছে।

বকুল ফুল এখন তেমন ফোটে না—সন্ধ্যার পরে কদাচিৎ তুই একটা ফোটে ও ঝরিয়া পড়ে। ফুল ফোটে ঘাসের বনে—অসংখ্য—অজস্র।—ঘাসের জঙ্গলে ফুলের মেলা। ঘন বেগুনী, হালকা বেগুনী, হলদে, গোলাপী, লাল, সাদা ফুল,—নীলাভ সাদা ফুল,—কোন ফুল তারার মত দেখিতে—কোনটি পাপ্‌ড়ির মত গঠন।—কলিকা ফুলের মত অতি ক্ষুদ্র হল্‌দে ফুলের মাঝখানটা লাল, যেন রক্ত চন্দনের ছিটা দেওয়া—ফুলে ফুলে আলো করা ঘাসের বন। প্রতি বৃক্ষে নূতন কিশলয় নূতন মুকুল নূতন পাতা—প্রতি লতায় নব নব ফুল-ফল।—প্রতি তৃণে বিচিত্র বর্ণের ফুল,—প্রতি বনানী বনপুষ্প ভূষিত।—উপরে নীচে—তরু শ্রেণীতে তৃণদলে নব সজ্জার সমারোহ—চারিদিকে নবীন বেশভূষা, ঘাসের বনে ঘুরিতে ঘুরিতে চোর কাঁটায় কাপড় বুটিদার! এমন নিঃশব্দে চোরের মত কাঁটাগুলি কাপড়ে বিঁধিয়া যায়! নিবিড় জঙ্গল ঘাসের,—অসংখ্য ফুলময়ী লতা।—দীর্ঘ সরল সবুজ তৃণদণ্ড উঁচু হইয়া উঠিয়াছে,—শীর্ষভাগটা পিপুলের মত;—কোনটির আগায় তিনটি করিয়া কদম ফুলের মত অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাদা কেশরময় ফুল,—ফুলগুলি 'মটরশুঁটির দানার চেয়ে বড় নয়। সে গুলি কানে পরিতে বেশ। সেই ঘাসের বনে ফুলের মেলায় প্রজাপতির উল্লসিত ভ্রমণ।—ফুলের সঙ্গে প্রজাপতির আশ্চর্য মিল। ফুল যেমন ছোট বড়,—প্রজাপতিও তেমনি ছোট বড়। সাদা হল্‌দে চিত্র-

বিচিত্র কত বিভিন্ন বর্ণের প্রজাপতি। ফুলের চেয়ে প্রজাপতির বর্ণ বৈচিত্র্য বেশি,—কালো-মখমল ডানায় সাদা সাদা ছিট দেওয়া বৃহৎ প্রজাপতিগুলি কি সুন্দর দেখিতে। আনন্দে তারা ফুলে ফুলে উড়িয়া বেড়ায়। ফুলের উপর প্রজাপতিকে চিনিতে পারা কঠিন। ফুলের কোমল দলে প্রজাপতির সমতুল্য সুন্দর বর্ণ মিশিয়া গিয়াছে।

বর্ষা শেষ হইয়া গিয়াছে। শরৎ আসিল,—ঋতু বৈচিত্র্য শরতের মত কোন্ ঋতুতে?—সন্ধ্যা হইতে শিশিরে ঘাস ভিজিয়া যায়। ভোর বেলা সমস্ত তৃণদল সাদা মুক্তার মত শিশির বিন্দুতে ঝলমল করে—একটু পরে সোনালী আলো আসিয়া পড়ে, শাদা মুক্তা, দেখ গোলাপী রং ধরিয়াছে। উজ্জ্বল নীল আকাশ—বাতাস হাল্কা ও উদাস। সন্ধ্যার পশ্চিম আকাশে গাঢ় সিন্দুর বর্ণ ঢালিয়া সূর্য যান অস্তাচলে।—এত উজ্জ্বল এত গাঢ় সে বর্ণ,—সাদা মেঘগুলি সে আভায় গোলাপী হইয়া যায়। নীল মেঘস্তূপ কাঞ্চন চূড়ায় ভূষিত হয়।—সমস্ত আকাশ জুড়িয়া অপূর্ব বর্ণলীলা,—সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসে, আকাশে তারা ফুটিয়া ঝিকমিক করে—তবু সে বর্ণলীলার শেষ নাই।—তেমনি বর্ণলীলা সকাল বেলা। আশ্চর্য দেখ,—পূর্বদিকের মেঘ রঞ্জিতও হয় না, দক্ষিণ দিকের আকাশ জুড়িয়া মেঘের রং নীল এবং গোলাপী।

শালবন—দূরবর্তিনী মুগ্ধকারিণী,
অবসর বিনোদিনী।—নিশায় মোহিনী ভয়ঙ্করী।
ঘাসের বন—নিয়ত সঙ্গিনী, বিশ্রামে কর্মে নিদ্রায় পার্শ্ববর্তিনী
দিবানিশি মধুময়ী সহচরী।

বর্ষার ঘন ঘোর নিশায়—হিমবর্ষী শীত-রাত্রিতে যখন শালবন অদৃশ্য,—কে তোমার আয়ত্তে?—কে দেয় তোমার নয়নে মনে স্নিগ্ধ আনন্দ দীপ্তি!

কিন্তু দেখ ঐ শালবন—কোমল সবুজ তৃণাচ্ছাদিত মাঠের কিনারায়

ঘন সবুজ শালবন রেখা,—নিবিড় বিস্তৃত বনানী সে—পূর্ব পশ্চিম প্রসারী যত দূর দৃষ্টি চলে।—শালবনের উপর দিয়া পূর্বদিকের বহুদূর গ্রামের ঘন বৃক্ষ শ্রেণী দেখা যায়·কিন্তু সে ছায়া অস্পষ্ট ধূসর মেঘবৎ।—উজ্জ্বল-রূপ শালবন সমগ্র দক্ষিণ ব্যাপিয়া আছে। আর আছে প্রান্তরে বৃহৎ শালবৃক্ষ—গোপাল রাখালের আশ্রয় দাতা।

কিন্তু শালবন মধ্যে সীমান্ত প্রহরী—বিচিত্র রূপ—বিভিন্ন আকৃতি। কোনটি বৃক্ষ মন্দির চূড়ার ন্যায়, কোনটির গঠন পত্র সহিত কারুকার্যময় মুকুট। একটি বৃক্ষ অবিকল খরগোস, কান দুইটি খাড়া, অর্ধ দেহ বাড়াইয়া পশ্চিম দিকে একাগ্র লক্ষ্য।—একটি বিচিত্র কারুখচিত ফুলদানীর উপর বৃহৎ শঙ্খ। দক্ষিণ দিকে একটি পক্ষী শাখায় উপবিষ্ট—তাহার পাশে একটি কবুতর বৃহৎ সুগঠন গ্রীবাটি বাড়াইয়া দিয়াছে।

কিন্তু যে অতি বৃহৎ হংসরাজ মাঝখানে,—গঠনৈপুণ্যে সে নিরুপম—দেহের উর্দ্ধাংশ দেখা যায়, নিম্নভাগ অদৃশ্য বনানীমধ্যে—আনত নীল দিগন্তে বৃহৎ সবুজ চঞ্চুটি আঁকা, গুচ্ছ গুচ্ছ পত্র পুঞ্জ ভারে গঠিত সুকোমল পরিপুষ্ট সবুজ দেহটি—পূর্ব দিকে মুখ করিয়া স্থির হইয়া আছে। সমগ্র বনানীর মাঝখানেও নিজ বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র। ঝড়ে বৃষ্টিতে বাতাসে বিধ্বস্ত দেহ দুই রাত্রির বিশ্রামে পূর্ববৎ সতেজ সুন্দর হইয়া উঠে।—নিত্য নূতন প্রতিবেশী হইয়াই আশে পাশে স্থায়ী আসন অধিকার করে।

জীব জগতের সঙ্গে উদ্ভিদ জাতির ঘনিষ্ঠ একাঙ্গ সম্বন্ধ।—সমগ্র পশু পক্ষী কীট পতঙ্গের নিবাস বৃক্ষে লতায় জঙ্গলে তৃণদলে ঝোপেঝাড়ে। সেই হেতু কি উদ্ভিদ জগতে পশুপক্ষীর রূপবিকাশ? আপনা হইতে তরুলতা কেমন করিয়া পশুপক্ষীর রূপ গ্রহণ করে কে জানে! এই অনবদ্য শিল্প স্বয়ং প্রকৃতি আপন হাতে গড়িতেছেন—তাই সে শিল্পবৈচিত্র্য অতুলনীয়। সে সৃষ্টি-রচনার আকর্ষণ চিরস্থায়ী, তাহার অভিনবত্ব চির নবীন।

বিরাট এক চিত্র আমার সম্মুখে। পূর্ব পশ্চিমে দীর্ঘ উর্ধ্বাধঃ সীমা

বিস্তৃত অসীম এক চিত্রপট। প্রভাতে কোমল উজ্জ্বল আলো-দীপ্ত আকাশে আঁকা নিবিড় সবুজবর্ণ রেখা, ঘন সবুজ সীমান্ত প্রহরী। দূরের কৃষ্ণাভ তরু-শ্রেণী, উজ্জ্বল ও কোমল সবুজ তৃণমণ্ডিত বিস্তৃত প্রান্তরে দীর্ঘ দীর্ঘ শাল ও বহেড়া। এখানে সেখানে স্তূপাকৃতি কোমল বন্য ঝোপ।

দ্বিপ্রহে তীব্র রৌদ্রঝলসিত প্রান্তর ও বন—আকাশ ও পৃথিবীর চিরন্তন অথচ পরিবর্তনশীল রূপ। স্থির শান্ত—কিন্তু উজ্জ্বল ও দীপ্ত।

সন্ধ্যার ছবির রূপ একবারে বদলিয়া গিয়াছে। ঘন শ্যাম ছায়ায় ধীরে ধীরে সবুজ রেখা কালো হইয়া মিশিতেছে। দিগন্তের কোলে উজ্জ্বল সিন্দুর আভা! প্রান্তর ও বনের রক্তবর্ণ পথ ধীরে ধীরে ঘোর লাল হইয়া উঠিল।

কি বিশাল চিত্র! অদৃশ্য চিত্রকর মূহুর্মুহু চিত্রের দৃশ্য নূতন করিয়া আঁকিতেছে—নূতন করিয়া সজ্জা দিতেছে। বর্ণের ভাণ্ডার তার অফুরন্ত। অহর্নিশি সে ভীষণ ব্যস্ত। এই আঁকে—মুছিয়া ফেলে, আবার আঁকে। কিছুতেই যেন তৃপ্তি নাই। কে দেখিল—কে না দেখিল—ভ্রুক্ষেপ নাই, সে শুধু তন্ময় হইয়া আঁকিতেছে। আশ্চর্য চিত্রপট, আশ্চর্য সে চিত্রপটের নিমেষে রূপসজ্জার পরিবর্তন। হায়! কে দেখিবে এই রূপ? এ অফুরন্ত শোভা? কার জন্য বিশ্বশিল্পীর এ হেন অক্লান্ত প্রয়াস?

ঘর বাঁধিয়াছি প্রান্তরে। পূর্ব মিশিয়াছে দক্ষিণ কোণে, দক্ষিণ সীমা পশ্চিম প্রান্তে, পশ্চিম উত্তরে, উত্তর আবার পূর্বে। চতুঃসীমার মধ্যে বিস্তৃত রহস্যজালময়ী প্রকৃতির অঞ্চল ছায়াতলে আমার বাস,—নীলকৃষ্ণ মেঘ পশ্চিম দিগন্তে, নীল ধূসর মেঘ দক্ষিণে, কৃষ্ণ ধূসর মেঘে পূর্ব আকাশ ঢাকা, সেই ঘন মেঘমণ্ডিত আকাশের নীচে দাঁড়াও,—বাতাসে বকুল ফুল ঝরিয়া পড়িতেছে। বকুল এখন বেশ ফোটে। লাল পথের উপর সবুজ ঘাসে ছড়ানো সাদা তারার মত ফুল। গাছের তলার হাওয়া এত কি স্নিগ্ধ! তাই রাখালেরা ঘুমায়, তাদের গো-পাল বিশ্রাম করে।

হঠাৎ একটা ঝম্ ঝম্ বাজনা। কিসের ধ্বনি এ? ট্রেন আসিতেছে, না অনেক ঘোড়ার গাড়ি ছুটিয়াছে? কিম্বা কোন চলন্ত যন্ত্রের ধ্বনি। কিসের শব্দ এমন অবিরাম ঝম্ ঝম্ ঝম্?

বহুদূরে পূর্ব দিকে শালবনের ওপারের মাঠের পারে দূর গ্রামের তরুশ্রেণী ঝাপসা দেখাইতেছে,—সাদা কুয়াসায় ঘেরা যেন,—ধ্বনি সেই দিকে, পূর্ব দক্ষিণ কোণে। ক্রমশঃ শব্দের জোর বাড়িল, কুয়াসার হাল্কা সাদা মেঘে শালবন অস্পষ্ট হইয়া গেল, শালবন ছাড়াইয়া এদিকে প্রান্তরের শূন্যতার মধ্যে কুয়াসা আর নাই। সে মিলাইয়া গেল আকাশের শূন্যতায়। কিন্তু ধ্বনি আরো কাছে। হঠাৎ প্রান্তরমধ্যে ঢালু পথে সঞ্চিত বৃষ্টির জল সবেগে উছলিয়া উঠিতেছে। বৃষ্টি—বৃষ্টি। বাজনা বাজাইয়া বৃষ্টির আগমন, তারপরে বৃষ্টি ঘাসের বনে—আমার গায়ে। তীরের মত তির্যক-রেখা বৃষ্টি ধারা, হিমের মত ঠাণ্ডা, কি বেগবান গতি! পলায়নের অবসর দেয় না। কিন্তু পলায়ন করিবে, এই কি উচিত? বনভূমিতে এ নিয়ম নয়।

পরিবর্তনশীল শরৎ প্রকৃতি। আকাশের কোণে কোণে কালো মেঘ—সাদা মেঘ ভাসিতেছে মধ্য আকাশে। চলমান চঞ্চল সে মেঘ, শালবনে রৌদ্র, মাঠে ছায়া। মাঠ ছাড়াইয়া এদিকে আবার ঘাসের বনে রৌদ্র। দেখিতে দেখিতে মাঠের ঘন ছায়া দ্রুত শালবনে গিয়া পড়িল, ঘাসের রোদ গেল মাঠে। পর মুহূর্তে শালবনের ছায়া ছুটিয়া আসিতেছে মাঠে—মাঠ পার হইয়া ঘাসের বনে আসিয়া পড়িল, চারিদিকে উজ্জ্বল রৌদ্র। আর ছায়া নাই। চক্ষের নিমিষে সমস্ত রৌদ্র নিবিয়া সর্বত্র ছায়ায় ঢাকা পড়িল। আকাশের মেঘের সঙ্গে পৃথিবীর রৌদ্র ও ছায়ায় অপরূপ খেলা। আলো পলায়, ছায়া যায় ধরিতে, ছায়া ছুটিয়া আসে, আলো আসে পিছু পিছু। দক্ষিণে ছায়া, পূর্বে রৌদ্র। পশ্চিমে ছায়া, দক্ষিণে রৌদ্র! সমস্ত আকাশ ব্যাপী উজ্জ্বল রোদ কিন্তু পৃথিবী ছায়াময়। সূর্য ঢাকা একখণ্ড সাদা মেঘের আড়ালে। সেই মেঘখণ্ডের চতুষ্পার্শে. তীব্র

জ্যোতি বিচ্ছুরিত হইতেছে সমস্ত আকাশে, এক নিমেষ মধ্যে সমস্ত পৃথিবী উজ্জ্বল রৌদ্রে ভাসিয়া গেল।

এই বিশ্বমাঝে যেখানে যা সাজে তাই দিয়ে তুমি সাজায়ে রেখেছ।

উদাস বাতাস ধীরে ধীরে স্নিগ্ধ হইয়া আসে। অপরাহ্ণ শেষের দক্ষিণ আকাশে গোলাপী মেঘের স্তর বিভিন্ন মূর্তি ধরিয়াছে। কোথাও সারি সারি মন্দির, কোথাও মেষশাবক ও কুকুরশাবক দল, কান-মাথা-মুখ সুস্পষ্ট। শান্ত শ্বেত ধূসর আকাশে আমার পাখীটি স্থির ভাবে আঁকা। আর একটু ডানদিকে বেজীর মত সেকালের অতিকায় এক প্রাণী। মাথার চুড়ায় হরিণ-শিঙের মত শাখা-প্রশাখা ছড়ানো। যে প্রাণীটি ঘাড় বাঁকাইয়া পূর্ব দিকে চাহিয়া আছে—স্থির লক্ষ্যে কি দেখিতেছে যেন। বাঁ দিকে সারি সারি দেখা দিয়াছে কয়েকটি উট ও বক—দীর্ঘ গ্রীবা বাড়াইয়া উত্তরে চাহিয়া আছে। এক একদিন এক একটি নূতন মূর্তি। সমস্ত রাত্রি ধরিয়া কি বনানীর মধ্যে অদৃশ্য শিল্পকারের নির্মাণ কার্য চলে? ভোর বেলা উষার আলোকের সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গলের ভিতর হইতে সুগঠিত সুসম্পূর্ণ প্রাণীটি ফুটিয়া ওঠে ধূসর নীল স্নিগ্ধ প্রভাত গগনের গায়ে। আহা, ঐ নীল আকাশে গগন-বিহারী পক্ষীবৎ ভাসিতে পারিতাম যদি?

সবুজ বনের কোলে গরু চরিতেছে,—সাদা ধূসর কালো পাটকিলে রঙের গো এবং বৎস। রাখাল কই? রৌদ্রে ঐ ছাতা-মাথায় বসিয়া বাঁশের বাঁশী বাজাইতেছে। স্তব্ধ দুপুর বেলার উদাস বাতাসে সে সুর ভাসিয়া আসে। একটি রাখাল গাছ তলায় শুইয়া,—আর একজন তার কাছে অর্ধ শায়িত। কয়েকজন রাখাল ও রাখালী বনের কিনারে কিনারে চলিয়াছে—ওখানে তো ওদের কোন দরকার নাই, অকারণ আনন্দের ভ্রমণ। কিংবা কুল বা জামের লোভে। দুই তিন বছর বয়স হইতে কুড়ি পঁচিশ বছরের রাখাল রাখালীর দল। মেয়েরাও গরু চরায়। একটি মেয়ে পুকুরে স্নান সারিয়া মাঠে দাঁড়াইয়া

আছে, পশ্চিমে হাওয়ায় তাহার খোলা চুল ও আঁচল পূর্ব মুখে উড়িতেছে। বাঙালী মেয়ে হিন্দুস্থানী মেয়ে। স্বাধীন অবাধ গতি। সমস্ত দুপুর ও বিকাল মাঠে কাটায় ওরা, কখনো গাছতলায় শুইয়া ঘুমায়, কখনো ঘুরিয়া বেড়ায়—কখনো পুঁটুলি খুলিয়া ভুট্টা বা মটরভাজা চর্বণ করে। প্রকাণ্ড প্রান্তরের দিকে দিকে ছড়ানো তাদের গো ও বৎস।

বৃষ্টি নামে—গো-পাল শালবন ঘেঁসিয়া দাঁড়ায়, শালতলে ভিড় করে। রাখালেরা গাছের গোড়া ঘেঁসিয়া আশ্রয় নেয়—মাথার উপর ঘনপত্র-রচিত ছাতা।

ধীরে ধীরে বেলা নামিয়া আসে, রৌদ্র হয় নিষ্প্রভ, বাতাসের উত্তাপ নিবিয়া স্নিগ্ধতা আসে, আগে আগে গরুর পাল, পিছনে রাখাল রাখালী ঘরের দিকে চলিয়াছে, অলস মন্থর গতি তাহাদের। কেহ কেহ গান ধরিয়াছে। সুবর্ণ রঞ্জিত আকাশতলে ঘন শ্যাম ছায়াময় সবুজ প্রান্তরে সে সুর বাজে বড় উদাস ও করুণ।

আমার ইচ্ছা হয় দুপুর বেলা অমনি করিয়া বন ঘেঁসিয়া গরুর পাশে পাশে বেড়াইতে,—অমনি অলস গতিতে। একবার তারা বনের মধ্যে যায়—গাছ পাতার ফাঁকে একটু একটু দেখা যায় তাদের, ক্রমে অদৃশ্য হয়। আবার বাহির হইয়া আসে।

কি অসীম নির্জনতার মধ্যে আমার বাস! একটি কুক্কুর রব, একটি পাখীর কাকলী নিস্তব্ধ-শান্তি ভঙ্গ করে না, শুধু শিয়ালরা প্রহর ঘোষণা করিয়া যায়। চারিদিকে মাঠ ও শালবন। ঘর বাঁধিয়াছি মাঠের মধ্যে।

হরিতকী বনে

লোকালয় হইতে দূরে গভীর বিস্তৃত অরণ্য। বিশাল শাখা প্রশাখা মণ্ডিত বিশাল তরুশ্রেণী, অতি প্রাচীন বন—কৃষ্ণ সবুজ নিবিড় পত্ররাশি,

অসংবদ্ধ বৃক্ষ কোথাও বিরাট দৈত্যের মত একাকী, কোথাও ঘন সন্নিবিষ্ট। শাখায় শাখায় অসংখ্য ফলভার। ঘোর সবুজ বন, পুঞ্জ পুঞ্জ হরিতকী গুচ্ছে গুচ্ছে ভারে ভারে শাখায় শাখায় শোভমান। শুনিয়াছি পক্ক হরিতকী খাইলে দিব্য জ্ঞান লাভ হয়—আজ পর্যন্ত মানুষের ভাগ্যে সে অমর ফল মিলে নাই। এই নিবিড় গহন বনে একটি কি মিলিবে? প্রতি বৃক্ষতলে এ প্রান্ত হইতে ও প্রান্ত খুঁজিয়া দেখিবে কি? শুষ্ক পত্রদলিত শব্দে বনচারী প্রাণী ঊর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান, বৃক্ষকাণ্ডে বসন বাধিয়া যায়,—কিন্তু মিলিবে কি?

শ্বেত ধূসর আকাশ ক্রমে নীল ধূসর ও ঘনশ্যাম হইয়া আসিল। ওপারের তরুশ্রেণী কালো, শালবন কৃষ্ণ সবুজ হইয়া উঠিয়াছে। আকাশে তারা ফুটিতেছে, চাঁদ নাই। সন্ধ্যার পরে রাত্রি, তখনো বনানীর কৃষ্ণ রেখা অস্পষ্ট। আরো পরে—আরো পরে প্রান্তর ও বন অস্পষ্ট হইয়া আকাশে মিশিয়া গেল। উপরে নীচে ঘন কৃষ্ণবর্ণ একাকার।

ঐ উঠিতেছে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ। আবার কালো আকাশে স্নিগ্ধ জ্যোছনা ছড়াইয়া পড়িল, ঐ দেখ, বনের ঘনকৃষ্ণ স্থির রেখা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

বৃষ্টি নামিল। চাঁদ ডুবিল, তারা ঢাকা পড়িল—বনানী অদৃশ্য হইল। আবার চাঁদ উঁকি দিয়াছে—তারা চাহিয়া দেখিতেছে, বনরেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে। দিন যেমন, রাত্রিও তেমনি, কৌতুকচঞ্চল খেলা আলো ও ছায়ার, চাঁদ ও প্রকৃতির, আকাশ ও পৃথিবীর। প্রভেদ শুধু, দিনের রূপ তীব্র ও উজ্জ্বল, রাত্রির সৌন্দর্য স্নিগ্ধ ও প্রশান্ত।

সম্মুখে শালবন। গভীর রাত্রির নিথর নির্জনতা চারিদিকে।

সেই সন্ধ্যা হইতে ঘাসের বনে ঝিঁঝিঁর একটানা অশ্রান্ত রব থামিল সবে। শিয়াল আসে, একে একে, এক দুই তিন চার, এই উহাদের সময় তঞ্চকতা করিবার। সোজা পথ ছাড়িয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া আলো ও আঁধারের ঠিক সীমা-রেখাটি ধরিয়া আসে—চোরের মত চকিত চঞ্চল চাহনি।

ফলের সন্ধানে যেখানে মাটিতে বিছানো ঘন লতার তলে ছোট বড় পাকা

কাঁচা ফল—সেই দিকে অথবা অপর কোন উদ্দেশ্যে? ঊর্ধ্ব মুখে কি যেন দেখে, লাফাইয়া উঠিয়া ধরিয়া ফেলে, কোন উড়ন্ত পতঙ্গ হইবে। সর্বদা সতর্ক—সর্বদা চকিত, তবু আম বকুলের ওপারে অন্ধকার ঘাসের বন দিয়া কদাচ যাইবে না, এই দিকের আলোকিত পথে যায়। ছোট্ট এতটুকু সুন্দর শৃগাল-শাবকটি মায়ের সঙ্গে চলিয়াছে। শিয়ালের চলনভঙ্গী কুকুরের মত খাড়া সোজা সটান নয়। সলম্ফ নৃত্যশীল গতি—যেন নাচিয়া নাচিয়া চলিতেছে। ঈষৎ শব্দ বা কোন বাধার আভাস মাত্রে তীরের মত ছুটিয়া পলায়।

বন রত্নাবলী

আলো-ঝলমল আম্রপত্ররাশিতে বকুল পত্রগুচ্ছে বৃষ্টির জল ঝিক ঝিক করিতেছে। ঘাসের বনে দীর্ঘ সরল তৃণদণ্ডের পিপুলাকৃতি শীর্ষদেশে আলো পড়িয়াছে। দীর্ঘতর তৃণদণ্ড, শীর্ষদেশ ঠিক বিছার মত, হাত দিতে ভয় করে। কদম ফুলের মত ঠিক দেখিতে ঘাসের ফুলগুলি, তেমনি শ্বেতকেশর-মণ্ডিত—একবৃন্তে পাঁচ ছয়টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুল উজ্জ্বল আলোকে দেখাইতেছে অবিকল মুক্তাগুচ্ছ। ঘাসের বনে ছোট ছোট সরিষার মত নীলাভ শ্বেত তা..-ফুলদল কি সুন্দর ফুটিয়া আছে। আরো সুন্দর নীলাভ ধূসর ও বেগুনী আভা কলিকা ফুলের দল। চারিদিকে তরুলতা বন জঙ্গলে নব সজ্জার যে সমারোহ তেমনি সমারোহ এই ঘাসের বনে। এরা বৃষ্টিতে স্নান করিয়াছে—আলোকে উজ্জ্বল হইয়া আছে। শালবন এখন দূরে কিন্তু ইহারা কত কাছে; ঠিক সম্মুখে, আয়ত্তের মধ্যে।

আমার কাছে জমকালো নামধারী কোন ফুল নাই, আছে শুভ্র কোমল বনফুল মৃদু স্নিগ্ধ সুবাসভরা। আছে ফুলভারনত দীর্ঘ দীর্ঘ তৃণদণ্ড। আছে নীল কাঁটা-জঙ্গলের রাশি রাশি মুক্তাফল। সবুজ মুক্তা দেখিয়াছ? সেই গুচ্ছ গুচ্ছ মুক্তাভারাক্রান্ত মুক্তা-লতাবনে আমার বাস। দিনে দিনে ক্ষুদ্র

মুক্তা বড় হয়—দিনে দিনে উজ্জ্বল কমলা রং ধরে, তারপরে উজ্জ্বল স্বর্ণ বর্ণ সোনার মুক্তাফল!—বৃন্দাবনের গোপাঙ্গনা আজ এই অপূর্ব মুক্তা দেখিলে মালা গাঁথিয়া কবরী ঘিরিতে ছাড়িত কি?

কিন্তু এই ঝলমল রূপরত্ন লইয়া ঐ অদৃশ্যপ্রায় বিশাল প্রান্তর ভুলিও না। ঐ প্রান্তরের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাঁটার ঝোপ—রাত্রিতে যা অস্পষ্ট, কিন্তু তুচ্ছ ভাবিয়া হেলা করিও না। কত ভিষগ-দুর্লভ ভেষজ, কত জীবজগতের নিত্যাবশ্যকীয় দুষ্প্রাপ্য অমূল্য ওষধি লুকাইয়া আছে ইহাদেরই মধ্যে। আজ তুমি বিংশশতাব্দীর শিক্ষার প্রতীক, সভ্যতাভিমানী, তুমি চিনিবে না—কিন্তু ইহা পৃথিবীমায়ের সজীব রত্নাগার।

পাত্র ভরিয়াছি রাশি রাশি বন্য কুঞ্চিতপ্রান্ত পত্রগুচ্ছে। স্নিগ্ধ সবুজ শ্যামরূপে চোখ জুড়ায়। আম্র বকুলের ঘন ডালপালা ও পাতার অতি-প্রাচুর্য-হেতু কয়েকটা ডাল কাটিয়া দেওয়া হইয়াছিল,—অনুতপ্ত অপরাধী চিত্তভার লইয়া গাছের তলায় ক্ষমা প্রার্থনা করি। নিষ্ঠুর কুঠারাঘাতে ছিন্ন বাহু,—নির্বাক ধ্যাননিরত পরম সহিষ্ণু তরুবর। ছায়া দিতেছ, ফল দিতেছ, ফুল দিতেছ। অজস্র দান তোমার, প্রতিদান এই নিষ্ঠুর আঘাত! তবু তুমি ক্ষমাশীল। কুণ্ঠাহীন দাতা।

বিচিত্র লীলা প্রকৃতির,—অলক্ষ্যে চলিতেছে শিল্পবয়ন। কর্তিত শাখা-মূল ঢাকিয়া গিয়াছে গুচ্ছ গুচ্ছ নব কিশলয় ও অজস্র পাতায়,—চিকণ শাখা বাহির হইতেছে—একটির পর একটি। একের বদলে বহু। পাপ ভার কিছু কমিল কি? না—না।

বনসঙ্গীত

গভীর রাত্রে বনানীর দিকে ফিরিয়া দাঁড়াও, একচিত্তে চাহিয়া দেখ, নক্ষত্র জ্যোতিতে চন্দ্রহীন আকাশ স্নিগ্ধ দীপ্তিমান। সেই ঈষৎ-দীপ্ত আকাশের গায়ে প্রান্তরের অতিকায় বৃক্ষাবলী প্রহরীর ন্যায় দাঁড়াইয়া। সীমান্ত প্রহরী ও

শালবন রেখা ঘোর কৃষ্ণবর্ণ তবু সুস্পষ্ট। রাত্রি যত গভীর হয় নক্ষত্রমালা তত দীপ্তিশালী—আকাশ ও পৃথিবী তত সুস্পষ্ট। অমাবস্যার রাত্রিও এ অনৈসর্গিক স্নিগ্ধ আলোক দেখিবে। তখন অনাহূত ধ্বনি কি শুনিতে পাও ?

শিয়ালেরা প্রহর ঘোষণা করিল,—বন হইতে মাঠে বাহির হইয়া আবার বনে মিলাইল। অপার্থিব নিস্তব্ধতায় চারিদিক থম থম করিতেছে,—শুধু ঘাসের বন হইতে কোন অদৃশ্য কীটের কিচ্ কিচ্ কিচ্, অবিরাম কাঁচি চালানোর শব্দ। নৈশ নিস্তব্ধতার সঙ্গে এই রবের একটা ঐক্য রহিয়াছে।

দক্ষিণা বাতাস শালবনের ভিতর দিয়া আরো স্নিগ্ধ হইয়া প্রান্তর পার হইয়া ঘাসের বনের উপর দিয়া গায়ে আসিয়া লাগে।

উদাস প্রান্তরের চেয়ে ঘন জঙ্গলের আকর্ষণ বেশি। কিন্তু দেখিলাম সন্ধ্যার পরে শাল ও হরিতকীর প্রাচীন অরণ্য। কি ভীতিপ্রদ ঘোর রূপ! সমস্ত রহস্য ও মোহ ভয়াবহ বেশে সে নিবিড় বন ব্যাপিয়া রহিয়াছে। বুঝিয়াছি অরণ্যের চেয়ে প্রান্তর ভাল।

রাত্রে দেখ উন্মুক্ত প্রান্তর,—দিনে দেখিও ঘন বনের মনোরম রূপ।

আর আমার শিশু শালবন, যে আমাকে সব: ভুলাইয়া দিল—মাটি করিয়াছে আমাকে। ও আমার শ্যামের বাঁশী, ঘরে থাকিতে দিবে না। রাত্রে বার বার উঠিয়া আসিয়া দেখি—আর দেখি পূর্বদিক ফর্সা হইল কিনা। বিছানায় পাশ ফিরিয়া চোখে পড়ে উত্তরের কালো আকাশ, নক্ষত্র দীপ্তি ও পথের ধারের বৃহৎ গাছপালার নিবিড় ঊর্ধ্বভাগ। এ পাশ ফিরিয়া দেখি নিস্তব্ধ উদার মাঠের সীমা শালবন।

দিনে রাত্রে নীরব শান্তির ব্যাঘাত করে রেলগাড়ি। পুরী প্যাসেঞ্জার, পুরী এক্সপ্রেস, মাদ্রাজ মেল, ভদ্রক লোকাল, মালগাড়ি। না, শান্তির সঙ্গে উহাদের বিরোধ নয়। বিশ্বপ্রকৃতির বীণাটির সঙ্গে উহাদের গতিশব্দ, বংশীধ্বনির তাল ও সঙ্গত ঠিক আছে।

পাঁচটার আগে আসে পুরী এক্সপ্রেস। অন্ধকার জঙ্গলের ভিতর দিয়া রক্তচক্ষু সরীসৃপের মত হুঙ্কার ছাড়িতে ছাড়িতে বাহির হইয়া আসে,—তখনো চারিদিকে অন্ধকার, শুধু পূর্বাকাশ দীপ্ত। পূর্ব হইতে দক্ষিণ পর্যন্ত সমস্ত নীল আকাশ ব্যাপিয়া উজ্জ্বল কাঞ্চন-শৃঙ্গ-মেঘ পর্বতমালা। সেই পর্বত গাত্রে আমার পাখীটি—আমার কবুতর সারস ও উট—খরগোস ও শিকারোদ্যত বিড়াল সারি সারি গলা বাড়াইয়া আছে প্রভাত প্রতীক্ষায়। আর একটা নূতন আগন্তুক আসিল বনরাজ্যে,—বৃক্ষদণ্ডের উপর বিস্তৃতপুচ্ছ প্রকাণ্ড একটা মাছ, যেন শূন্য সাগরে সাঁতার দিতেছে।

দক্ষিণ-পূর্ব কোণ বহুদূরের তরুশ্রেণীরও ওপারে। ধনপুরা ষ্টেশনের আলোকদীপ্তিতে সহসা আকাশ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, ট্রেন বিদায় করিয়া আবার নিবিবে। ঝক্ ঝক্ ঝক্—তার পরে পুল পার হইবার শব্দ, শাল-জঙ্গল হইতে দুটি অগ্নিচক্ষু দেখা দিল কালো প্রাণীটার। এ দিকে ঘাসের বনের উপর আলোর সীমানায় একটা শিয়াল আসিতেছে। বোধ হয় এমন সময় কাহাকেও দেখিবে প্রত্যাশা করে নাই। খাক্ ও উহার অন্বেষণ কার্যে। কিন্তু ট্রেন দেখিতে শিয়াল পালায়—শিয়াল দিখিতে ট্রেন! অপেক্ষা করে না কেউ, দুই সমান ধাবমান! অন্ধকারে সোনার অল্পনা কাটিতে কাটিতে গাড়ীর জানালার আলোগুলি দ্রুত ছুটিয়া চলিয়াছে, নিমেষে বন্দীবাসের ওপারে অদৃশ্য হইয়া গেল। শিয়ালটি কোন সজী বনে লুকাইয়াছে।

পশ্চাতে উত্তর, সম্মুখে দক্ষিণ; পশ্চাতে উদ্বেগ, সম্মুখে শান্তি, ইহারই মধ্যে প্রান্তর। বৃহৎ দুঃখের প্রতিমূর্তি, ঐ উত্তরের বিশাল বন্দীবাস।

একবার দেখিও, উত্তরের পথে নহে, সে রক্ষিত রিজার্ভ পথ, সশস্ত্র শান্ত্রী ঘেরা। কিন্তু রেল লাইনের ধারের নিম্নপথে দাঁড়াইয়া দেখিবে, দেখিতে পাইবে পশ্চিমের সে বৃহৎ বিলের ওপার হইতে, দেখিবে শালবনের পরপারের পথ ঘুরিয়া আসিবার সময়, সে সুউচ্চ চূড়া বহু—বহু দূর হইতে দেখিতে পাইবে, ঐ অর্ধোন্নত গৌরব-মন্দিরের গম্বুজ! যতদূর হইতে দেখ,

কংসাবতী নদী পার হইয়া আসিবার সময় দেখ, বোধ হইবে নিতান্ত নিকটে বহুদূর হইতে তোমাকে আকর্ষণ করিয়া আসিবে, কিন্তু আয়ত্তে পাইবে বহু বিলম্বে।

একবার দাঁড়াইয়া দেখ। অমন করিয়া দেশকে ভালবাসিতে জান কি?

বনের বাণী

ভালবাসি ঘাসের বন—বড় ভালবাসি।

শালবন—নৃত্যপরা মোহিনী অপ্সরা।

ঘাসের বন—স্নিগ্ধরূপা—কল্যাণী মধুরা।

শালবন—মনোহরা।

ঘাসের বন—মনোরমা।

শালবনে তীব্র আকর্ষণ—।—ঘাসের বনে গভীর স্নেহ!

ঘাসের বন এখন সম্বল। দিন দিন ফুলের মেলা বসিতেছে সে বনে। কত লতা, সে লতা তোমার মাধবী ও কুঞ্জলতার চেয়ে হীন নয়, ক্ষুদ্র বলিয়া অবহেলা করিও না। ক্ষুদ্র শুক্তি ধারণ করে মহামূল্য মুক্তা। তৃণদণ্ড আশ্রয় যার সে আকারে ক্ষুদ্র হইবে বৈকি। কিন্তু দেখ তার ফুলভার—বেগুনী-কল্‌কে নীল-কল্‌কে হল্‌দে কলকে; সাদা তারা, নীলাভ তারা, পদ্মের মত পাপড়ী সরিষার মত ক্ষুদ্র—বিভিন্ন বর্ণ ও বিভিন্ন গঠনের অসংখ্য ফুলে আলো করা সবুজ বন। মধ্যে মধ্যে লজ্জাবতী লতা লুকানো। সাদা কদমফুলের গুচ্ছগুলি বন ছাড়িয়া উঁচু হইয়া উঠিয়াছে,—উঁচু হইয়া উঠিয়াছে আরো বেশি—তৃণদণ্ডের মাথায় সারি সারি বিছা। সরল সবুজ দণ্ডগুলি মাথায় উষ্ণীষ-পরা প্রহরী-দল তৃণক্ষেত্রের। ঘাসের বনের কিনারে দোপাটী ফুল বোনা হইয়াছিল—মাটির গুণে গাছ বাড়িল না, আধ হাতের কম গাছ প্রকাণ্ড লাল গোলাপের মত দোপাটী ধরিয়াছে অনেক। এই বনেও অসংখ্য কীট-পতঙ্গ, এতবড় বৃশ্চিক কোথাও দেখা যায় না। পুচ্ছ উঁচু করিয়া কি সগর্বে চলাফের

করে। সন্ধ্যায় আলো জ্বলিলে দেখা যায় কীট-পতঙ্গের মেলা। শালবনের সঙ্গে সর্বাংশে ঘাসের বনের সমতুল্যতা, তফাৎ শুধু ছোট ও বড়।

ঐ আমার কণ্টক শিরোভূষা পরা বেজীটা, ঈষৎ ক্রুদ্ধ ও একাগ্র ভঙ্গী, তার পাশে একটা বল্‌গা হরিণ মাথা তুলিয়াছে আজ—আর একটা উদ্যত লম্ফ অশ্বের ঘাড় পর্যন্ত দেখা যাইতেছে। আর বহুদূরে দেখ ওপারের নীলাভ বৃক্ষসীমা। সূর্য অস্তাচলে। পশ্চিমে অগ্নিগিরি শ্রেণী—চূড়ার উপর চূড়া,—শ্রেণীর উপর শ্রেণী—পশ্চিমাকাশের বর্ণ জ্বলন্ত আগুনের মত—পূর্ব ও দক্ষিণ ঘোর লাল। পৃথিবী ঘোর সন্ধ্যার ছায়ায় প্রায় অন্ধকার,—বনানী কালো, প্রান্তরের গৈরিকবর্ণ প্রায় শ্যাম, কিন্তু আকাশ অন্ধকার নহে—একটা কোমল আভায় দীপ্ত। পূর্ব ও দক্ষিণ আকাশে লাল রং মিলাইয়া গিয়াছে—পশ্চিম আকাশের অগ্নিআভা তখন গাঢ় লাল বর্ণ ধরিল। ঐ আমার উত্তর সীমার নীল কাঁটাবনের ঘন পত্র-পল্লব—মুকুলিত-শীর্ষ বেগুনী ফুলের গুচ্ছ, আঁধারেও ঈষৎ দৃশ্যমান সোনালী মুক্তার ঝাড। বিকশিত গুচ্ছ গুচ্ছ বনমঞ্জরী।

আরক্ত গৈরিক চোরকাঁটা-বনে মেষের দল প্রায় অদৃশ্য, গৃহাভিমুখে ফিরিতেছে।

সবুজ প্রান্তরে চোরকাঁটায় ছাইয়া গিয়াছে। দূর হইতে প্রান্তরের রং ঈষৎ লাল। সমস্ত দুপুর সাদা বকের মেলা বসে সেখানে। পাখা মেলিয়া একবার ওড়ে একবার বসে—সমস্ত বৎস ও গো-পালের পাশে পাশে বকের সভা। একটা মাছরাঙা উড়িয়া আসিয়া নিমগাছে বসিল। পুষ্পে পুষ্পে পুষ্পান্তরে ভ্রমণ-রত মধু-মক্ষিকার মৃদু গুঞ্জনধ্বনি মৃদু বায়ু হিল্লোলে মিশিতেছে। সে গুঞ্জন-রব ক্ষণে অসন্তুষ্টিতে উচ্চ—ক্ষণে প্রসন্নতায় বিলীন!

কি চায় অন্তর? বন ও প্রান্তর পর্বত ও জলাশয়ের তীব্র আকর্ষণ অনুভব কর না কি? সেই আমাদের আদিম আশ্রয়—আদিম আবাস। তাই দেখিবামাত্র চিত্তকে টানে চুম্বকের মত। তুমি ত্রিপুরার রাজবাড়ী

দেখিয়া মুগ্ধ হইতে পার—কিন্তু মায়ার টান শালবন-প্রান্তে ক্ষুদ্র কুটীরটির উপর। সভ্যতা মানুষকে নাগপাশে জড়াইয়াছে, স্বাধীনতা হারাইয়া খাঁচায় বন্দী,—মন তাই মুক্তি প্রয়াসী। সমস্ত মায়ার জাল ছিঁড়িয়া ফেলিয়া আবার কি আগের দিন ফিরিয়া পাই না? অসভ্য জঙ্গ্লী বুনো যা খুশী বল—তবু ছদ্মবেশ ছাড়িয়া একবার অন্ততঃ নিজরূপ ধরিতে দাও। আমি ঘর বাঁধিব বনের কাছে—প্রান্তরের ধারে। লাল পথের কিনারে। আমার পাতার কুটীর আঙিনায় খরগোস নির্ভয়ে নাচিবে। বিজলী বাতির রেশ পৌঁছিবে না সেখানে। মাটির দীপ বাতাসে কাঁপিবে। বনের শুষ্ক ডাল ভাঙিয়া গাছতলায় উনান জ্বালিব, ভিজা কাপড় শুকাইব বৃক্ষ-শাখায়।

ইন্দা—ক্ষুদ্র গ্রাম

জঙ্গল ও প্রান্তরবহুল স্থান। কিন্তু দেখিলাম অসংখ্য বাড়ী ঘর ঠাসাঠাসি হইয়া উঠিয়াছে। দোতালা, তিনতালা, একতালা, সংকীর্ণ পথ। দশ বৎসর আগের সে উন্মুক্ত নির্জন ইন্দা অপরিচ্ছন্ন এক নগরীর অতি কদর্য রূপ ধরিয়াছে আজ। সেখান হইতে ফিরিয়া আসিতে পথের ধারে এক মাঠে দেখি বেদেরা ছাউনি ফেলিয়াছে, ইন্দার বিকৃতরূপে পীড়িত মন জুড়াইল। সেখানে বসিতে সাধ হয়, বসিলে আরাম পাইবে। এই বর্ষা-বাদলেও নিজ নিজ আঙিনা তাদের অত্যন্ত পালিশ ও পরিপাটী। বাঁশের খুঁটিতে দড়ি দিয়া আটকানো হোগলার ঢালু দোচালা ছাউনি, জল বসিতে পায় না—পড়িবামাত্র ঝরিয়া পড়ে। ঘর ক্ষুদ্র—আঙিনা বৃহৎ। খোঁটায় বানর বাঁধা। কুকুরগুলি ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। অসম সাহসী বেদের দল। গৃহস্থালী তাদের ছোট নয়। তবু দেশ দেশ ঘুরিয়া দিন কাটায়, সর্ব দেশে সকলের সঙ্গে ইহাদের পরিচয়। বেদের তাঁবু পড়িলে পুলিসের কাজ বাড়ে। কিন্তু ইহারা নিশ্চিন্ত। ঐ দেখ রূপার গহনা-পরা কিশোরীর কেশ-বিন্যাস। ঐ তার ঠাকুরমা দারুন ঝগড়া বাধাইয়া দিয়াছে। জঙ্গল হইতে কাঠকুটা

সংগ্রহ করিয়া চায়ের জল চড়াইল। চায়ের নেশা ঢুকিয়াছে ইহাদের মধ্যে। সভ্যদেশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাঙালীর জীবনযাত্রার ধরণ অনেকটা আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে।

সন্ধ্যা হইয়া আসিল।—ধপধপে আঙ্গিনার ঘরকান্না দেখ। দূর হইতে কলসী করিয়া জল বহিয়া আনিতেছে।—মাজা কলসী রূপার মত চক্‌চকে।—পুরুষেরা কেহ তামাক ধরাইল,—কেহ সুখদুঃখের কথা কহিতেছে,—সংক্ষেপ ও নিশ্চিন্ত জীবনযাত্রা। ঘর বাড়ী সংসার অতি সরল।—যেদিন ইচ্ছা বাস তুলিল,—ইচ্ছামত নূতন স্থান পছন্দ করিয়া আবার ঘর পাতিল,—পুরুষেরা ঘর দুয়ার বাঁধে। মেয়েরা রান্নার যোগাড় দেখে। উহারা কি অসুখী? ইন্দ্রার তেতালা বাড়ীর অধিবাসীর মতন উহারা ব্যস্ত নয়, বিব্রত নয়।—তাদের সঙ্গে উহাদের তফাৎও বেশি নয়। মূল সকলেরই প্রায় এক, উদ্দেশ্যও এক,—শুধু আচার প্রণালী বিভিন্ন।

তাই বলিয়া ভাবিও না অমন অপরিচ্ছন্ন যাযাবর জীবন কাহারো কাম্য। কালীপড়া হাঁড়ি—দড়ি বাঁধা অর্ধাহার-জীর্ণ বানর কুকুর—রাশীকৃত ছেঁড়া ময়লা কাপড়ের পুঁটুলি ও কদর্য বেশবাস বা ঘরকন্না ঘাড়ে বহিয়া দেশ দেশ ছন্নছাড়া হইয়া বেড়ানো কাহারো ইচ্ছা হইতে পারে? আমি যে বনবাসের কথা বলিতেছি—সে উদাহরণ পাইবে তুমি পুরাণে। শবরীর কুটীর—নল-দময়ন্তীর বনশিবির—দুঃখিনী সীতার পর্ণকুটীর,—ঋষিকন্যার বনগৃহ—সন্ন্যাসিনীর নির্জন আশ্রম। তোমরা নির্বাসন দাও আমাকে—সভ্য জগৎ হইতে। ছদ্মবেশ খুলিয়া মুখোস ফেলিয়া স্বাধীন বনবাসে আমার ইচ্ছা-সুখে বাস করিতে দাও।—কীট পতঙ্গ সঙ্কুল শালবনে অবশ্য নয়।—এ জলাশয়-বিরল দেশ,—শীত গ্রীষ্মের সমতা নাই—জলবায়ু ঠিক-নিয়ম মানিয়া চলে না। এখানে আমি ঘর বাঁধিব না।

নিবিড় অরণ্যেও নয়।—দুর্গম বনের ভয়াবহ রূপ দেখিয়াছি বিলের ওপারে সুবৃহৎ শালবনে।—ঘোর সন্ধ্যায় সে কি ভীষণ রূপ! দেখিয়াছি

রাত্রে হরিতকী বনে—ভীম কঠোর সে ঘনান্ধকার বন,—সেখানে বাসা বাঁধিয়া কি লাভ? যেখানে দিবসের আলো নিবিবার সঙ্গে সঙ্গে শজারু-কণ্টকের ন্যায় তীক্ষাগ্র উচ্চ অসিবর্মশালী ঘোর পিঙ্গলবর্ণ বৃহৎকায় ভীষণদর্শন বনকীট অরণ্য ছাড়িয়া লোকাবাসের সন্ধানে বাহির হইয়া আসে।

এ বনে নহে—এ অরণ্যে নহে,—
সখি সে বন কত দূর?
যে বনে আমার——

বনমালী

এতটুকু শালিক ছানা—ঝড়ে নীড় হইতে পড়িয়া ডানা ভাঙিয়া গিয়াছে। মানুষ দেখিয়া ভয় পায়—পলাইতে গিয়া পারে না।

ক্রমে বড় হইল,—নাম বনমালী। পালক তার হিন্দুস্থানী,—শিখায় বাংলা কথা। বনমালী! বল্—'রাধা—গোপাল কৃষ্ণ সীতা গোবিন্দ রাম' ফলে বনমালী কিছুই শিখিল না

এ জাতীয় শালিক কথা বলে। অতি শিক্ষা হইল আপদ। কিন্তু বনমালী বড় বুদ্ধিমান। আপনি খাঁচা হইতে বাহির হয়—ঘাসের বনে আহার খুঁজিতে শিখিয়াছে। কাক শালিকের তাড়া খাইয়া চিঁ চি শব্দে খাঁচায় আসিয়া পলায়। পালক না খাওয়াইলে খায় না—অন্যে দিলে মুখ ফিরায়। একটা ডানা এখনো একটু ঝুলিয়া আছে। উড়িতে পারে না বেশি দূর।

সন্ধ্যায় আসে বিড়াল—একদিন খাঁচাটা দেখিয়া গিয়াছিল। বনমালী আড়ষ্ট!—পালক আসিলে কিচ্ কিচ্ করিয়া কি বলিল। বিড়ালটা বস্তাবন্দী হইয়া রেল লাইনের ওপারে নির্বাসন গিয়াছে।

খাঁচার ভিতর বাটিতে খাবার জল—ছাতু—সে জলে স্নান করিয়া ঠোঁট দিয়া বাটিটা উল্টিয়া রাখিয়া দেয়। আপনি খায় না। দুপুর বেলা পালক ঘুমায়,—বনমালী চঞ্চপুটে চুল ধরিয়া টানিয়া উঠায়। এখন ছাতুর গুলি কাঠিতে বিঁধিয়া একটা একটা করিয়া খাওয়াও।—পালকের পায়ে পায়ে

ঘোরে।—অনেক সময় বিপদ বাধে,—কখন বা বনমালী আগুনে পড়ে বা বঁটিতে কাটে।

ঘাস কাটার সময় উড়িয়া যায় কিষাণের কাছে—ফড়িংএর লোভে। তারাও ফড়িংটি পায়—অমনি দেয়। একের বিনাশ—অন্যের পুষ্টি।

এক একদিন শালিকের দলে ভিড়িয়া বনমালী উঠিয়া মাঠে চলিয়া যায়। পালক ব্যাকুল হইয়া ডাকে। ক্রমে আসে—শালগাছে বসে। পরে মাটিতে নামে।—স্বজাতিরা উহাকে ত্যাগ করিয়াছে। মানুষের স্পর্শে ও সমাজচ্যুত।—দুই একটা উদারমনা সঙ্গীকে দেখি মধ্যে মধ্যে বনমালীর সঙ্গে। আবার দুষ্ট শালিক ভুলাইয়া লইয়া নিয়া ঠোকরাইয়া আহত করিয়া দেয়।

পালক বাজার হইতে ফিরিতে দেরি করিলে উন্মনা বনমালী সর্বত্র খুঁজিয়া বেড়ায়। শেষে নিরাশ হইয়া আমগাছে উড়িয়া গিয়া বসে। চব্বিশ পরগণা বাসিনী আদর করিয়া ডাকে—বনমালী—অ বনমালী! উলে আয় না? উলে আয়। ওল্—ওল্—বনমালী কর্ণপাত করে না।

বৃষ্টি ঝরিতেছে ঝর-ঝর ঝর। বর্ণলীলাহীন সান্ধ্য আকাশ।

আসন্ন রাত্রি,—সহসা দক্ষিণ আকাশপটে এ কি চিত্র! চিত্র না মূর্তি?—দিক ব্যাপিয়া শ্রেণীবদ্ধ মেঘাগ্নি-পর্বতমালা,—একটি পর্বতের উপরে অগ্নিবর্ণ এক অতি বলবান শিশু জানু পাতিয়া উর্ধ্বমুখে যুক্তকরে,—তাহার পাদমূলে অতিকায় এক অগ্নিবর্ণ কুক্কুর।

পশ্চিম আকাশে রক্তিম বর্ণ ধীরে ধীরে ফুটিতেছে। দক্ষিণ আকাশে দেখ—পূর্ব চিত্র অদৃশ্য!—এক অগ্নিবর্ণ বিশালকান্তি বর্ষীয়ান উদাসী আনত-শিরে দুই কর যুক্ত করিয়া প্রণাম করিতেছেন, পদতলে অনুজ্জ্বল পীতবর্ণ এক কুক্কুর উর্ধ্বমুখে।

কয়েক মুহূর্ত,—আবার দেখিয়াছ? বর্ষীয়ান অন্তর্হিত! রহিয়াছে মাত্র এক বিরাটকায় কুক্কুর।

আবার দুই মুহূর্ত,—সব মিলাইয়া গিয়াছে। একটি নির্জন উন্নত পর্বত আছে মাত্র।

রাত্রি এক প্রহর।—ক্রমে আকাশে পীত অগ্নি ও রক্ত বর্ণের লীলা শেষ হইয়া কৃষ্ণবর্ণ মেঘে আকাশ একাকার হইয়া গেল। শৃগালকুল ঝঙ্কার দিয়া উঠিতেছে।

নূতন রক্ষীবর্গ দেখা দিয়াছে শালবনে! এক পর্বতে বৃক্ষশাখে একটি চিল বসিয়া নতমুখে নখরবিদ্ধ শিকার দেখিতেছে। একটা কুকুর অতি আগ্রহে উত্তর মুখে উচ্চ হইয়া আছে। চূড়াবিহীন ময়ূরটি কি মেঘ দেখিয়া অমন পেখম ছড়াইল? একটি প্রকাণ্ড ছত্র,—ও ছত্রের তলে দাঁড়াইবে কে? শিকার ধরিতে উদ্যত মার্জ্জারটাকে দেখ!—ঐ পশ্চিম দিকে কি ওটি? কি ভীষণকায় গণ্ডার,—নাসিকায় বৃহৎ উন্নত খড়্গ শোভমান।—বনের ভিতরে নহে—বন হইতে বাহির হইয়া আসিল প্রায়। আর ঐ প্রান্তরে এক অতি বিরাট হস্তী উর্ধ্বে শুঁড় তুলিয়া পশ্চাৎপদে ভর দিয়া দাঁড়াইয়াছে।

সূর্য অস্তাচলে। পত্রান্তরালে তির্যক কাঞ্চন রেখায় বনভূমিতল বিচিত্র রেখাঙ্কিত। বনের নিবিড় সান্নিধ্যে চলিতে চলিতে শাখাপত্রপল্লবে গতি রোধ করিয়া ধরে,—আহ্বান করে বনাভ্যন্তরে সাদর আকর্ষণে!—ছায়াময় নিঃশব্দ শান্ত বনতল।

এই গতি এই ভ্রমণ উদ্দেশ্যহীন? অথবা কোন্ উদ্দেশ্য? গভীর নৈরাশ্যে অন্তর ডুবিয়া যায়,—চারিদিকের জগৎ যেন স্বপ্নের ঘোর মায়াজালে আচ্ছন্ন।

বিষাদভরা চিত্তে বনানীর পত্রপুষ্প স্পর্শ করিয়া চলিতে চলিতে সহসা ঘোর ছায়াচ্ছন্ন ঘন বন হইতে সন্ধ্যার গাড়ীটি বাহির হইয়া আসিয়া একান্ত পাশ দিয়া চলিয়া গেল। উহার ঘনকৃষ্ণ চিক্কণ চলন্ত দেহে হাত রাখ, তোমার হাত ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া ছুটিবে। পশ্চাতের সাদা কালো ক্ষুদ্র গাড়ীটির বারান্দায়

রেলিং ধরিয়া গার্ড ঝুঁকিয়া দাঁড়াইয়া আছে। চতুর্দিক কাঁপাইয়া বাঁশীতে তীব্র হুঙ্কার ছাড়িয়া বিভ্রান্ত চিত্তকে সচকিত করিয়া দিয়া গাড়ী চলিয়া গেল। ও এই মায়াসন্ধ্যার নিত্য সশব্দ ইঙ্গিত—

"এবার ঘরে চল।"

বনমধু

মধুর দিবালোক,—

তেজোহীন রৌদ্র। বাতাস উদাস-অলস। প্রান্তরে বৎস গোছাগল এবং বকপক্ষীর মেলা। সবুজ বনের গায়ে সাদা রেখা আঁকিয়া বককুল বার বার উড়িতেছে—কখনো এদিক হইতে উড়িয়া ওদিকে গিয়া বসে—আবার এদিকে আসে, কিংবা গাভীর পায়ের ফাঁকে ফাঁকে তৃণের মধ্যে সন্ধান করিয়া বেড়ায়। রাখালেরা অকারণ সমস্ত মাঠে ঘুরিতেছে। আকাশ জুড়িয়া ধূসর সাদা মেঘ। আকাশ প্রান্ত ধনুকের মত বাঁকা হইয়া নামিয়া মিশিয়াছে শালবনে। আমার সীমান্তরক্ষীবর্গ সব চেয়ে সুন্দর দেখায় এই সাদা আকাশের গায়ে। এমন ভাবে আর কোন রঙে মেশে না।

সন্ধ্যা হয় হয়। গা ছাড়িয়া দিয়া গো-পাল ঘরের দিকে চলিল। রাখালীদের চুল ও আঁচল উড়িতেছে। বার বার মেঘ গর্জিতেছে, বিদ্যুৎ চমকাইল দু'একবার। পশ্চিম দিকে ভয়ানক মেঘ—দক্ষিণ দিগন্ত পরিষ্কার; পূর্বে উত্তরে সাদা মেঘের মাঝে মাঝে কালো মেঘ। জোর বাতাস উঠিয়াছে—কি হিম বাতাস! দুই এক ফোঁটা বৃষ্টি, মুষলধারা নামিবে, বকুলফুল বাতাসে উড়িয়া উড়িয়া পড়িতেছে। শাল ও বকুলতলা সর্বাপেক্ষা শীতল।

পেয়ারা ও আম্রকুঞ্জতলে ঘাসের বনে বসিয়া শালবনের দিকে দেখ,—বন আকর্ষণ করে তোমায়, ভালবাসে ঘাসের জঙ্গল। চারিদিকে, তোমার হাতের কাছে পায়ের নীচে অসংখ্য ফুল, পিপুল, চোরকাঁটা ও বিছা। উহারা কামড়ায় না। পেয়ারা গাছটির মূল হইতে আগা পর্যন্ত অজস্র পাতায় ঢাকা।

অসংখ্য ডাল পাতা হেলিয়া নামিয়া মাটি ছুঁইয়াছে প্রায়,—নিঃশব্দে বসিয়া থাক সেখানে, এমন কোমল গালিচা কোথায় আছে ? শালবন তোমার প্রিয়া, ঘাসের বন মধুময়ী সঙ্গিনী।

আমার শালবন। বনের মায়ার জাল আমি ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছি। বন রহস্য ভেদ করিয়াছি। তোমরা কি জান ঐ শিশুশালবনমধ্যের ঐশ্বর্য-বারতা ? আমি বনচারী—বনবাসী। বন ভালবাসী।

বনবীর

মাঠের বন ঝোপগুলি হলদে ফুলে আলো হইয়া গিয়াছে। দীর্ঘ বৃন্ত ঝোপ হইতে উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে—মাথায় রাশি রাশি ফুলের গুচ্ছ। কাঁচা সোনার মত উজ্জ্বল বর্ণ। এই ফুল তোমরা চাহিয়া দেখ না—আদর কর না। প্রান্তর মধ্যে আকাশস্পর্শী বিশাল শালবৃক্ষরূপী এক মহাকায় মহাবীর, সমগ্র প্রান্তর এবং শালবনের অধিপতি। ঘোর সবুজ বর্ম চর্মাবৃত দেহ, শিরে শোভন শিরস্ত্রাণ—দৃঢ় কটিবন্ধশালী, ঈষৎ নতশিরে চিন্তানিবিষ্ট ভাবে দণ্ডায়মান। উজ্জ্বল নীল নির্মল আকাশ দিগন্তে তাহার সুদৃঢ় নিবিড় হরিৎ অনিন্দ্যগঠন রেখায় রেখায় অতি সুস্পষ্ট প্রকাশমান।

যোদ্ধ বেশধারী যোদ্ধার দক্ষিণে শালবনমধ্যে এক অতিকায় নকুল লেজে ভর দিয়া বনমধ্য হইতে সটান সরল খাড়া হইয়া উঠিয়াছে। মাথায় কণ্টক কারু-কার্যযুক্ত শিরোভূষা, ক্রুদ্ধ সশঙ্ক একাগ্র ভঙ্গীতে সৈনিকের দিকে চাহিয়া আছে। শালবনমধ্যে সর্বাপেক্ষা এইটি বড় এবং ইহার যোগ্য শিকারী প্রান্তরের ঐ বীর সৈনিক।

কিন্তু সৈনিকবর অধোমুখ নিশ্চেষ্ট।

নকুলের আশে পাশে আর কয়েকটি নূতন অতিথি। সম্মুখে বনের উপরে একটি বৃহৎ বানর বসিয়া আছে—এবং পশ্চাতে দুইটি পেচক।

ধীরে ধীরে সন্ধ্যালোক ঢাকিয়া কৃষ্ণ ছায়া নামিতেছে।

বন বীণা

অমাবস্যা—শনিবার। ঘোর অন্ধকারময়ী অমানিশি। সূচীভেদ্য অন্ধকার—আকাশ পৃথিবী একাকার।

কিন্তু তা নয়। গভীর অমানিশার অন্ধকারে খোলা জায়গায় দাঁড়াইয়া দেখ, আলো রাখিও না কাছে। মৃদু ও স্নিগ্ধ একটা দীপ্তিতে আকাশ ঈষৎ দীপ্ত। পৃথিবী ও আকাশ একাকার নয়,—শালবনের কালো রেখা সুস্পষ্ট। অন্ধকার অথচ দৃশ্যমান প্রান্তর, অতি সুস্পষ্ট মাঠের প্রহরীগণ। শুধু বনানীর রক্ষীবর্গ চিনিতে পারা যায় না। স্নিগ্ধোজ্জ্বল শান্ত বাঁকা আকাশে বনরেখা আঁকা। আকাশ পৃথিবী বন ও প্রান্তর নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র, আদৌ একাকার নয়। অভ্যস্ত চক্ষু এ অন্ধকারে অনায়াসে পথ চলিতে পারে। প্রকৃতপক্ষে অন্ধকার নয়; ঘন মেঘে আকাশ না ঢাকিলে অন্ধকার হয় না। অন্ধকার দেখি শুধু আলোকের জন্য।

দিবসে অরণ্য—নিশায় প্রান্তর।

ভয় নাই—ভয় নাই, শান্তিদায়িনী অন্ধকার নিশা, সমগ্র জগৎ সুপ্ত। রে অভিমানী—নির্ভয়ে ঊর্ধ্বলোকে দৃষ্টি প্রসারণ কর।

কি স্নিগ্ধ প্রশান্ত রূপ অমানিশার। শান্ত প্রকৃতি চারিদিকে; নিম্নে নিঃশব্দ পৃথিবী উপরে সীমাহীন আকাশ; ভুবন ব্যাপিয়া ভুবনমোহিনী অমাবস্যা গম্ভীর নিস্তব্ধতাভাবে বিরাজ করিতেছে;—সে অনন্ত মহিমময় সৌন্দর্য দেখিয়াছ কি? এই রূপ পূর্ণিমা নিশায় দেখিবে না। ভয়ঙ্কর গম্ভীর রূপ, এ ভীমকান্তরূপ! ভয়ে অন্তর কাঁপে—কিন্তু দেখিতে সাধ। দুই নেত্র ভরিয়া একাকী এই অলৌকিক রূপ দর্শন কর। অনন্ত রূপসাগরে অতুল লাবণ্য-তরঙ্গ উঠিয়াছে।

বিশ্ব বীণার ঝঙ্কার শুনিয়াছ কি? শোন এই ঘোর অমাবস্যার অর্ধ নিশায়। বীণা বাজিতেছে জগৎ ব্যাপিয়া, এক অখণ্ড মৌন রাগিণীর ঝঙ্কার উঠিতেছে নীরবে। ঐ শোন অনাহত ধ্বনি!

ঝক্—ঝক্—ঝক্, ঘোর সবুজ বনের ভিতর হইতে ভয়াল এক দীর্ঘদেহ প্রাণীর ন্যায় চিক্কণ কালো গাড়ীটি বাহির হইয়া আসিল। উহার গায়ে হাত রাখিলে হাত ঠেলিয়া দিয়া ছুটিবে—আদর চায় না ও, অলস বিলাসের সময় নাই। ও কর্মী, ছুটিয়াছে প্রয়োজনে, নিজের প্রয়োজনে নয়—তোমার জন্য, পরার্থপর।

এক দুই তিন, ছাপান্নখানি গাড়ী—ছোটবড় চতুষ্কোণ গোলাকার ঢাকা খোলা, নানা আকার। ধূম ছাড়িতে ছাড়িতে ইঞ্জিনটি গর্বিত নেতার মত পিছনের অনুচরবর্গকে লইয়া চলিয়াছে। কালো ধূমে নির্মল শূন্যলোক মলিন হইয়া গেল।

পিছনের গাড়ীটার গার্ড রেলিং ভর দিয়া সুদূর শালবনের দিকে চাহিয়া আছে। শালবনের মায়া কি বাঁধিবে উহাকে? যাযাবর বৃত্তি, কত নদ-নদী পার হইয়া, প্রান্তর বাহিয়া, কত গিরি রন্ধ্র ভেদ করিয়া, দিবানিশি উহার ধাবমান যাত্রা।

অন্ধকার—অন্ধকার, যখন সমস্ত দিনের আলো মিশিবে আঁধারে—তখন সেই অন্ধকারের স্নিগ্ধ তারকাদীপ্তিতলে আমি পথ চলিব।

* * * *

কি ঘন জঙ্গল—পাতায় পাতায় বৃষ্টির জল টলমল করিতেছে। বনের মধ্যে নীচু মাটিতে ঘাসের বনে জল জমিয়া ক্ষুদ্র জলাশয়,—একটি দুটি নয় অসংখ্য।—দুই দিকের ঘোর বনের মধ্যে কেশিয়ারীর উচ্চ লাল পথ।

একটি জলাশয়ের মধ্যে এক প্রকাণ্ড বিছা ভাসিতেছে।—এত বড় বিছা চোখে পড়ে না। চারিদিকে কঠিন তীক্ষ্ণাগ্র দীর্ঘ দীর্ঘ কালো রোম। মাঝখানের রোমের বর্ণ বাদামী। ঐ প্রাণীটার বিন্দুমাত্র স্পর্শে দেহে অসহ্য জ্বালা ধরে। কিন্তু এমন ভয়ানক অস্ত্রধারী হইয়াও কি নিরুপায়। এই ক্ষুদ্র জলাশয়টি হইতে উদ্ধার হইবার ক্ষমতা উহার নাই। কে বাঁচাইবে

উহাকে? ও হিংস্র নয়, কিন্তু উহার স্পর্শ আতঙ্কজনক—মারাত্মক। জলে ভাসিতেছে—যেন একটি কালো বাদামী ব্রাশ।

একটি পাতা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিলাম—ধরিয়া তীরে আসিবে, কিন্তু উহার ভারে পাতা ডুবিয়া যায়। এবার একটি ডাল—তখন তীরে আসিল। তুমি বারণ করিলে—কিন্তু একটা প্রাণীবধে কোন উপকার বল? উহাদের বংশ সংখ্যাতীত।

বনে চাঞ্চল্য

ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল।

স্নিগ্ধালস প্রভাতে জাগ্রত জগৎ সবে ধীরে ধীরে কর্মচঞ্চল হইতে আরম্ভ করিতেছে,—সহসা সর্বত্র চমকিত করিয়া গম্ভীর রবে পাগলা ঘণ্টি বাজিয়া উঠিল।

কারাবাস হইতে বন্দী পলায়ন করিয়াছে। সেই সংবাদ চারিদিকে ঘোষণা করিয়া ঘণ্টা বাজিতে লাগিল ঘোর রবে।

সুসজ্জিত সশস্ত্র শান্ত্রী প্রহরী দিকে দিকে উধ্বর্শ্বাসে ছুটিতেছে। পাগলা ঘণ্টা বাজিতে লাগিল—ঢং ঢং ঢং ঢ—ং।—টং টং টং ট—ং।

পলাতক যদি বনমধ্যে লুকাইয়া থাকে,—যদি বল্মীক স্তূপান্তরালে বিশ্রাম করে,—যদি ঘুমাইয়া থাকে গুল্ম ঝোপের মধ্যে—শেষ রাত্রের অসম্পূর্ণ নিদ্রা পূরণ করিতে,—কিম্বা তরু-কোটরে, অথবা জটিল শাখারণ্যের ঘন পত্রাভ্যন্তরে?—অতএব অন্বেষণ কর সমস্ত সম্ভব অসম্ভব স্থান, কর তুমুল অন্বেষণ—প্রাণপণ অন্বেষণ।

ঘণ্টা বাজিতেছে অবিরাম।

ধাবমান প্রহরীর পদশব্দে শান্ত নির্জন বনপ্রান্তর সচকিত হইয়া উঠিল। ধেনু বৎস সভয়ে দিগ্বিদিকে ছুটিতেছে। ভীত কুকুরের তীক্ষ্ণ চীৎকার—খাদ্যান্বেষী শৃগালের পুনরায় বনমধ্যে পলায়ন। সন্ত্রস্ত পক্ষীগণ এ বৃক্ষ

হইতে কলরব করিতে করিতে ও বৃক্ষে উড়িয়া উড়িয়া বসিতে লাগিল। অচল অটল শুধু সীমান্তরক্ষীবর্গ। এবং প্রান্তর-প্রহরীগণ।

পূর্বাহ্ন-রৌদ্রে মহাকায় সৈনিকের ঘোর হরিৎ বর্ণ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। পূর্বাহ্ন-রৌদ্র সমগ্র বনানীকে উজ্জ্বল রূপ দিয়াছে।

সৈনিক হইতে অতিকায় নকুল দ্বিশত হস্ত ব্যবধানে।

সৈনিক হইতে অতিকায় ঐরাবত প্রায় দ্বিশত হস্ত ব্যবধানে। নকুল ও ঐরাবতের পরস্পরের ব্যবধান কিঞ্চিদধিক দ্বিশত হস্ত।

এবং পূর্বাহ্ন রৌদ্রে ধাবমান শান্ত্রীগণের কটিবন্ধ ও শাণিত সামরিক লৌহভূষা বার বার বিদ্যুৎ দীপ্তির ন্যায় জ্বলিয়া উঠিতেছে।

ঘণ্টা থামিয়া গিয়াছে।

নিরাপদে ধরা দিবার আশায় বন্দী কষ্ট করিয়া পলায়ন করে নাই।

বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর।

অন্বেষণ-চঞ্চল অরণ্য আবার পূর্ববৎ শান্ত নিস্তব্ধ। শান্ত প্রান্তরে ধেনুবৎস পূর্ববৎ শান্তভাবে বিচরণশীল। সচিন্তিত অধোমুখ সৈনিকের পদতলে বসিয়া ভগ্নমনোরথ নিরুৎসাহ শ্রান্ত কারাপ্রহরীর দল বিশ্রাম করিতেছে।

শুধু একটি ঈষৎ রুক্ষকেশা সুদর্শনা কৃষক বালিকা প্রভাত হইতে একমনে একই ভাবে একাকিনী কুলীর মত প্রান্তরের এককোণে শুষ্ক তৃণচ্ছেদন কার্যে নিযুক্ত। চাষীদিকের ঐ চাঞ্চল্য তাহাকে নিমেষের জন্যও বিন্দুমাত্র বিচলিত করে নাই।

অপরূপ রূপ-সমারোহ যদি দেখিতে চাও—সে শরৎ আকাশে।—অনন্ত বৈচিত্র্যময় উর্ধ্বে ঐ অনন্ত নীলাকাশ—অনন্ত বৈচিত্র্যময়ী নিম্নে এই শ্যাম সজ্জাশালিনী ধরণী,—আর অনন্ত বৈচিত্র্যের পসরা খুলিয়া আসে যায় ষড়ঋতু,—ছয় রাগের ছত্রিশ রাগিণীর ন্যায় নিত্য নিত্য নব নব রূপসজ্জাশালী ষড়ঋতুর জয়পতাকা চিরকাল ভূলোক দ্যুলোকে বিরাজমান।

হেমন্ত ;—প্রভাতে শিশির মুক্তামণ্ডিত—সন্ধ্যায় কুয়াসার জালে ঘেরা শীত ;—নীরস কঠিন রূপ—হিমতুষারপাতে পৃথিবীর হরিৎ শোভা ম্লান করিয়া দেয়। বসন্ত ;—সে নূতন সজ্জাভার লইয়া আসে হৃত সৌন্দর্যশ্রী ফিরাইতে। চারু কান্তি ঋতুশ্রেষ্ঠ বসন্তের কোমল স্পর্শে নবমুকুল নবকিশলয় নবপল্লব অঙ্কুরিত হইয়া নূতন হরিৎ আভার আভাস দেয়। গ্রীষ্ম ;—প্রচণ্ড মূর্তি—রিক্ত গৈরিক মূর্তি—কিন্তু সেই উদাসীনের বরাভয়তলেই প্রকৃতির শ্যাম সবুজ-শ্রী বিকশিত হয় ধীরে ধীরে—শুভ্র সুরভি পুষ্পদল সসঙ্কোচে ভয়ে ভয়ে দুই একটি করিয়া ফুটিতে থাকে—নীল প্রসন্ন সন্ধ্যাকাশে মৃদুকম্পিত তারার মত,—নিষ্পত্র তরুশাখা আবৃত হয় গুচ্ছ গুচ্ছ নবীন পল্লবভারে।—তার পরে আসে উজ্জ্বল সবুজবসনা শুভ্র কুসুমালঙ্কৃতা জলধারা-বর্ষিণী বর্ষা। সারা বৎসরের ধূলিজাল ধুইয়া নির্মল উজ্জ্বল রূপে সাজাইয়া দেয় প্রকৃতিকে। পঞ্চ ঋতুতে শত বৈচিত্র্য,—কিন্তু শরৎ-আকাশের মত কোন ঋতুর আকাশ এমন অনন্ত বৈচিত্র্যশালী ?

শরতের প্রথম দিনে প্রভাতে অর্ধ জাগরণ অর্ধ তন্দ্রার মধ্যে কি অনুভব কর নাই, “শরৎ এসেছে—বুঝি শরৎ এসেছে ?” আর সেই মধুর স্পর্শ—অতি স্নিগ্ধ বায়ুর ঈষৎমাত্র শিহরণ ?—এমন চপল এমন বিলাসী এ হেন খাম-খেয়ালী আর কোন ঋতু ?—কোন ঋতু এমন আনন্দময় ? দিনে শতবার শত রূপ আর কোন ঋতুর ?—দুপুরের দারুন উত্তাপ—বৈকালে বায়ুলেশহীন অসহ্য গুমোট ; কি আসে যায় ?—সন্ধ্যায় ঐ শান্ত আকাশতলে বসিয়া কে মনে রাখে সে কথা যখন শেফালী-সুবাস-মদির অলস সুস্নিগ্ধ বাতাস বহিয়া চলে,—আর ঊর্ধ্বে চিত্রের পর চিত্রে—বর্ণের পর বর্ণে অবর্ণনীয় স্বর্গীয় দৃশ্য ফুটিতে থাকে,—যে চিত্রের শেষ নাই ?

বর্ষার ন্যায় ঘনমেঘে শরতেও আকাশ ঢাকা পড়ে—বিজলী চমক দেয়। সজোরে বহিয়া যায় সজল আর্দ্র বায়ু।—মেঘ গর্জিয়া ওঠে—ঝম্ ঝম্ শব্দে বৃষ্টি নামিয়া আসে। হেমন্তের ন্যায় কখনো বা শীতল স্পর্শ আনে।—কদাচ

আবার হঠাৎ নিমেষের জন্য উত্তর বায়ু বহিয়া শীতের ইঙ্গিত দিয়া গেল।—প্রচণ্ড রৌদ্রের জ্বালা প্রখর-মূর্তি গ্রীষ্মকে স্মরণ করাইয়া দিবে। ষড়ঋতুর স্পর্শ এবং আভাস দণ্ডে দণ্ডে মিলিবে এক শরৎ কালে।

ঐ যে প্রথম ভাদ্রের উজ্জ্বল পীতাভ রৌদ্ররেখা—বৈশাখের ন্যায় তীক্ষ্ণ শুভ্র নয়—উদয়মাত্র অসহ্য নয়—দৃষ্টিতে, দেহে, স্পর্শে।—শীত-প্রভাতের ন্যায় সুখস্পর্শও নয়। ও আজ বর্ণের পরিবর্তন লইয়া প্রথম নামিয়া আসিল পৃথিবীতে।—ঐ রং ঐ রূপ শরতের বৈশিষ্ট্য। দণ্ডে দণ্ডে ক্ষণে ক্ষণে রূপ পরিবর্তন। এই রৌদ্র এই মেঘ—এই বৃষ্টি,—মুহূর্তে অসহ্য তাপ,—আবার স্নিগ্ধ শীতল বায়ু বহিতেছে।

শরৎ-পৃথিবী পীতাম্বরা—কি হরিৎবসনা—অথবা গৈরিকধারিণী সে বিচার করিও না। ঊর্ধ্বে নভোমণ্ডলে শুধু চাহিয়া দেখ অফুরন্ত বর্ণের লীলা—অনবদ্য—অভিনব—অতুলনীয়।

অপরাহ্ণ দ্রুত মিশিয়া গেল সন্ধ্যায়,—দক্ষিণ আকাশ ঘন মেঘাবৃত,—পশ্চিমাকাশও মেঘে অদৃশ্য—পূর্বাকাশের ঈষৎ স্বচ্ছ খণ্ড খণ্ড অনিবিড় মেঘ-মধ্যে প্রচ্ছন্ন সন্ধ্যার উজ্জ্বল স্বর্ণকিরণমালা রূপের বিপনি খুলিয়াছে ঐ উত্তর আকাশ জুড়িয়া। বিশাল স্বচ্ছ-নীলাভ সে নভপটে ঘোর নীল মেঘখণ্ড বিশাল আকাশ জুড়িয়া। বিশাল দ্বীপ, বৃহৎ কুম্ভীর, প্রকাণ্ড নৌকা—নানা আকারে শোভমান। চলন্ত নয়—অচঞ্চল।—ভাসমান নয়, স্থির নিবিড়ভাবে আকাশ-সংলগ্ন। নীলবর্ণ নৌকার অগ্রভাগ,—কুম্ভীরের মুখ এবং পুচ্ছ,—দ্বীপের চারিপ্রান্ত লোহিত পাটল বর্ণে রঞ্জিত। ইহারি অনেকটা নীচ দিয়া শূন্য পথে মেঘ সজ্জা চলিয়াছে পূর্ব হইতে পশ্চিমে,—মৃদু গতি,—অতি ধীরে ধীরে। কত শত বিচিত্র মেঘদল,—অন্ত কি আছে?—কোথাও বৃহৎকায় হংসশাবকাকৃতি পক্ষীদল,—ঐ একটি অতিবৃহৎ অশ্বারূঢ় এক বালক পশ্চাতে নতশির দুইটি শশক।—আবার বামে দেখ—ভীষণাকার বিরাট সিংহ ক্রুদ্ধ উদ্যত ভঙ্গীতে ঊর্ধ্বমুখ—অগ্নিবর্ণ কি বিশাল যে আকার,—আবার দেখ মুহূর্ত পরে কেশরীর উপরার্ধ পরিবর্তিত হইয়া গেল—এক দীর্ঘগ্রীব অশ্বের উপরার্ধ।

উত্তরপূর্ব আকাশে ফুল ফুটিয়াছে এবার,—গোলাপী, উজ্জ্বল হলদে, লাল গোলাপী কমলা বর্ণ, কি প্রকাণ্ড ফুল, কি বৃহৎ ফুলের ঝাড়,—সুন্দর ঐ একটি ফুল ধরিবে পৃথিবীতে এমন পুষ্পপাত্র একটিও আছে কি? সোনার গোলাপের মত পীতাভ লোহিত পাপড়ি যেন সদ্যবিকশিত,—বৃন্ত নীচের মেঘমধ্যে অদৃশ্য। শতদলে প্রস্ফুট রক্তবর্ণ পদ্ম,—দীর্ঘবৃন্ত রজনীগন্ধা যেন হেলিয়া আছে আপন ভরে। বিচিত্র বর্ণের বিবিধ ফুলের রাশি স্তরে স্তরে সাজানো। অপূর্ব পুষ্প নৈবেদ্যভার কে অমন করিয়া আকাশে সাজাইল, কার জন্য?

রং বদলাইয়া গেল। দক্ষিণ আকাশ স্বচ্ছ সবুজাভ,—দীর্ঘ দীর্ঘ রক্ত প্রবালদ্বীপ ভাসিতেছে সবুজ সাগরে—নিস্তরঙ্গ সাগর—নিশ্চল দ্বীপ!

আবার রচিত হইল সুদীর্ঘ পথ উজ্জ্বল পীত বর্ণের পথ সারি সারি।—

নিঃশঙ্ক মন, ক্ষীণচন্দ্রালোকিত আকাশতলে,—হঠাৎ বিন্দু বিন্দু বারি-স্পর্শ—কখন ধূসর কালো মেঘে দিক ঢকিয়াছে,—অপেক্ষা করিবে কি?—ঐ ঘনকৃষ্ণ লঘু মেঘজাল দ্রুত চলিয়াছে পূর্ব হইতে পশ্চিমে—একের পর এক, সারির পর সারি—সবেগ ব্যস্ত গতি। ঝটিকাবৎ উদ্দাম বায়ু সমস্ত দীর্ঘশির বৃক্ষ শাখাপত্রমধ্যে ঝড় তুলিয়াছে। মেঘের আড়ালে বিদ্যুৎ চমকিল,—সে প্রভায় মুহুর্মুহু দিক উদ্ভাসিত হইয়া উঠে,—অমনি করিয়া ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধ করিয়াছিল।

মেঘের ফাঁকে তারা উঁকি দিতে চায়। ঘোর রক্তবর্ণ আলো চারিদিক ছড়াইয়া পড়িল। ও আলো এবার ঐ কৃষ্ণ মেঘের মধ্যে ডুবিবে। ঐ যে শান্ত বাতাস শোঁ শোঁ করিয়া তরুপত্ররাশির ভিতরে ঢেউ তুলিয়াছে—ও আবার উদ্দাম হইয়া উঠিল বলিয়া।

ঐ শোন ঝম্ ঝম্-ঝম্!—নিবিড় তিমির তমসায় পৃথিবী ঢাকা পড়িল। আহা,—সুন্দর শরতে কেন এ উৎপাত?—ঐ তীব্র বজ্রনাদ-শব্দে ভয়ব্যাকুল পক্ষীরা আর্তনাদ করিতে করিতে বৃক্ষাশ্রয় ছাড়িয়া ইতস্ততঃ উড়িতেছে।

শরৎ প্রভাত বর্ষার রূপ ধরিয়া দেখা দিল। সমস্ত আকাশ কৃষ্ণাভ ধূসর মেঘে ঢাকা। মূষলধারে বৃষ্টি অবিরাম ঝরিতেছে ঝর-ঝর-ঝর। মুহূর্তে মুহূর্তে মেঘের ঘোর গর্জন,—আকাশ জুড়িয়া বিদ্যুৎ জ্বলিতেছে। কাকলী-হীন বৃক্ষশাখা—পক্ষীদল কুলায়ে অন্তর্হিত। পশু লুকাইয়াছে বিবরে—মানুষ গৃহকোটরে। শুধু শালবনমধ্যে ক্ষুদ্র বনতরু আপনার জলধৌত সবুজ পাত্রে বৃষ্টিস্নাত সুরভি শ্বেত পুষ্পগুচ্ছের ভার সযত্নে অঞ্জলি ধরিয়া আছে—ঊর্ধ্বে আকাশের দিকে। রৌদ্রহীন দ্বিপ্রহর মেঘের ভারে স্তব্ধ। ঐ ঘোর মেঘাবরণ ছিঁড়িয়া সন্ধ্যার জবাকুসুমকান্তি কোন পথে দেখা দিবে আজ?

বাতাস নিশ্চল হইয়া গিয়াছে—বৃক্ষদল নিশ্চল, যেন ধূসর চিত্রপটে আঁকা ছবি। বৃষ্টিজালে আচ্ছন্ন প্রকৃতি যেন কিসের প্রতীক্ষায় আছে।—কি সে? কে আজ আসিবে এই আলোবাতাসশূন্য দিগন্ত পথে?—বর্ষা শেষে আবার নব বর্ষার দিনে?

বহু বহু দূরে অভূতপূর্ব এক অস্পষ্ট ধ্বনি—সমস্ত উত্তর দিগন্ত মুখরিত করিয়া দিল।—কি অপূর্ব দৃশ্য এ? আকাশ নিবিড় শ্বেত ধূসর বর্ণ—তাহারি অনেকটা নিচে পৃথিবীর উপরে বিশাল বিস্তৃত এক স্বচ্ছ কৃষ্ণ অতি লঘু মেঘ-জাল সমগ্র মধ্য আকাশ ঢাকিয়া নক্ষত্রবেগে দক্ষিণাভিমুখে ভাসিয়া চলিয়াছে,—ধনুকমুক্ত শরের মত বাঁকা রেখায় বৃষ্টিধারা ভীষণ বেগে নামিয়া আসিল। এক নিমেষে প্রবল বায়ুবেগ পরিণত হইয়া গেল কালবৈশাখীর উদ্দাম ঝড়ে। অসাময়িক ঝটিকা বহিতেছে—শোঁ শোঁ রবে।

পশ্চিমে সারি সারি ধূসর কৃষ্ণ হস্তীশাবক—নিতান্ত ক্রীড়াচপল শাবক খেলাচ্ছলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শুঁড় ঊর্ধ্বে তুলিয়া আছে। শতাধিক শাবক এক ভাবে শুঁড় তুলিয়া অতি ধীরে ধীরে দক্ষিণে চলিয়াছে।

আসন্ন সন্ধ্যা। বৃষ্টির মধ্যে ঘোর অন্ধকার আকাশে পৃথিবী ঢাকিয়া গিয়াছে।—চারিদিকে জলপ্লাবিত ঘাসের বনে ভেককুলের উল্লসিত কলরব।

বৃক্ষের কোটরে কোটরে শাখায় শাখায় বিচিত্র কীটপতঙ্গ দলের নানা রাগিণী যেন সন্ধ্যারতির বাজনা। কিন্তু নীল পুষ্পপাত্রে কৈ আজ সে পরিপুষ্ট পাপড়ীদলে-বিকশিত অতি বৃহৎ অগ্নিবর্ণ সান্ধ্য গোলাপ ?

মায়া-মরীচিকা !—আমি মায়া—তুমি মায়া,—বিশ্ব সংসার সব মায়া। ঘোর মায়ারাজ্যে বাস। ঐ ঘোর নীলাঞ্জন-যবনিকা ভেদ করিয়া দৃষ্টি কি চলে না আর—স্বরূপ দেখিবে কবে ?

একটি চিত্রপটে শত শত চলচ্চিত্র। অনন্ত পট—সংখ্যাতীত চিত্র—এমন আর আছে কোথায় ? একের পর এক, সারের পর সার—একই পটে একসঙ্গে সহস্র চিত্রের প্রদর্শনী। ছায়া ছবি নয়—রঙ্গীন চিত্র। এক যায়, আর আসে।

ছিন্ন ছিন্ন ছোট ছোট ঘোর বেগুনী মেঘ—দেখিতে দেখিতে সেই মেঘে আগুন ধরিয়া গেল।

একটি ঘোর ধূসর বর্ণের প্রকাণ্ড প্রাচীর,—দুইটি বলিষ্ঠ কুকুরশাবক তুলার মত সাদা রং—একটি সম্মুখের পাদুটি দিয়া প্রাচীরটি ধরিয়া সকৌতূহলে দেখিতেছে,—অপরটি ফিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে,—পুচ্ছ এবং কান দুটি ঊর্দ্ধোত্থিত।

আর-একটি দিগন্ত জুড়িয়া বসিয়া আছে ঘন ঘোরবর্ণ এক বিরাট ভল্লুক, উদ্যত কিন্তু ক্রুদ্ধ নয়, যেন কি দেখিতেছে।

গম্—গম্—গম্—শূন্যগর্ভ মেঘের ডাক।

কে বলে রাত্রি অন্ধকার ?

অন্ধকার হয় মেঘে আকাশ ঢাকিলে। বর্ষারাত্রি ভিন্ন অন্ধকার নাই। অমাবস্যা অন্ধকার নহে।

নির্ম্মল মেঘহীন আকাশতলে নিঃশব্দ জীবজগৎ সুপ্ত—না,—নিশাচরগণ সুপ্ত নহে।—নিঃশব্দে মৃদু বায়ু বহিতেছে, অতি মৃদু শন্ শন্ শব্দ বৃক্ষপত্র-

মধ্যে—কঙ্কন ঝঙ্কারবৎ।—অতি কোমল সুরভি পুষ্পতুল্য সুখস্পর্শ সে নৈশ বায়ুপ্রবাহ।

ক্রমে রাত্রি গভীর হইবে—ক্রমে বাতাসে শীতলতা বাড়িবে,—এই বাতাসেই ধীরে ধীরে বৃন্তচ্যুত হইয়া বকুলশেফালী ঝরিতে থাকিবে নীরবে। প্রভাতে ইহারাই স্পর্শশিহরণ আনিবে দেহে মনে—মনে করাইয়া দিবে—বুঝি শরৎ আসিয়াছে।

নির্মেঘ নীল আকাশে লক্ষ লক্ষ হীরার ফুল ফুটিয়াছে,—নীল সমুদ্রে ভাসমান মণিরত্নদীপের ন্যায়।—দীপ অচঞ্চল, কিন্তু দীপশিখা যেন বায়ু-স্পর্শে মৃদু কম্পমান।—নক্ষত্রদীপ্তিতে নীলগগন-নীলাম্বরা পৃথিবী ঈষৎ উদ্ভাসিত—ঈষৎ দীপ্ত।—অস্পষ্ট মায়াময় জগতের মত। স্নিগ্ধ দীপ্ত দিগন্তে বৃক্ষাবলী কৃষ্ণশির তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। প্রত্যাশায় আছে—কখন নিশা-শেষে উজ্জ্বল স্বর্ণকিরণমালা সকলের আগে দেবাশীর্বাদের মত বৃক্ষশির স্পর্শ করিবে।

বার বার বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিতেছিল—একবার এদিক আবার ওদিক—কখনো দিগন্তে, কখনো মধ্য আকাশে—সমগ্র নভোমণ্ডল ব্যাপিয়া মুহুর্মুহু ঝলক। বিদ্যুৎ অদৃশ্য—চমক সুদৃশ্য। মেঘশূন্য আকাশে প্রচ্ছন্ন বিদ্যুতের এই এক নূতন খেলা। কিন্তু অর্থহীন খেলা নয়,—আগামী দিনের নৈসর্গিকতত্ত্ব প্রচ্ছন্ন আছে উহারই মধ্যে।—জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে—শুভ্র প্রসন্ন—অথবা ঘোর করাল কোন মায়ার মূর্তিতে প্রত্যক্ষ হইয়া নামিবে উহা তাহারই আভাস।

ছায়ানীল মহাপটে স্নিগ্ধ মুক্তাজ্যোতি-ঢেউ খেলানো ছায়াপথে হীরক-চূর্ণ ছড়ানো। পূর্ব প্রান্তদেশ হইতে উঠিয়া মাঝপথে পথটি দ্বিধা-বিভক্ত হইয়া পশ্চিমে প্রস্থান করিয়াছে। দিনে দিনে ঈষৎ তির্যকভাবে সরিয়াছে দক্ষিণ হইতে উত্তরে।

বসিতে সাধ হয় দিগন্ত তলে—কিন্তু দিগন্ত ধরা দেয় না। তুমি যেখানেই থাক, আকাশ থাকিবে ঠিক মাথার উপরে—দিগন্ত বহু দূরে।

আমি তোমাকে দেখিব দিগন্ত তলে, তুমি আমাকে। তোমার কাছে দিগন্ত যেমন সুন্দর—আমিও দেখিব তেমনি। সকলের কাছেই দিগন্ত অপ্রাপ্য।

ঝর—ঝর—ঝর। উজ্জ্বল দিবালোক-প্রফুল্লতার মধ্যে সহসা বৃষ্টি ঝরিতেছে,—অশ্রুসজল হাস্যদীপ্ত প্রকৃতির এই রূপ বড় সকরুণ, মধুর।

অতি বিশাল অর্ধ বৃত্ত রেখা ফুটিয়া উঠিল সাদা মেঘের উপরে—সপ্তবর্ণ রঞ্জিত রামধনু ক্রমশঃ সুস্পষ্ট হইতে হইতে দিগন্ত জুড়িল—কিছু উপরে আর একখানি বৃহত্তর ধনুকের অস্পষ্ট আকার—লক্ষ্মণের ধনু ঐ—হায় বীর সৌমিত্রি !—সকল শৌর্য বীর্য পরাক্রম তোমার অগ্রজের অন্তরালে,—আজও দুইখানি ধনু পাশাপাশি—একটি সুস্পষ্ট—অপরটি অদৃশ্যপ্রায়।

পান্নার মত স্বচ্ছ সবুজ আকাশে উজ্জ্বল কমলা রঙের পথ পড়িয়াছে পূর্ব পশ্চিমে।—দীর্ঘ প্রশান্ত সে পথের পাশে পাশে গোলাপী ফুলের স্তবক শত-শত। পথের দুই কিনার ঘন বেগুনী বর্ণে রঞ্জিত।—যেমন গৈরিকবসনা পদ্মার তীরে সবুজ বনরেখা। দেবকুমারীরা সান্ধ্যভ্রমণে বাহির হইবে ঐ পথে,—তাহাদের স্বর্ণসূত্র এবং পদ্মমৃণালসূত্রে নির্মিত বসনের অঞ্চলাগ্র মলয়ানিলে উড়িবে।—মলয়ানিলে চঞ্চল হইয়া উঠিবে সে পারিজাতমালা-ঘেরা মেঘকজ্জ্বল কেশপাশ।—মেঘের ঐ মন্দার নিন্দী শোভা দেখিয়া তাহাদের পদ্মপলাশ নেত্রে ফুটিবে বিস্ময়—এবং রক্তকুসুমাধরে দেখা দিবে অপূর্ব মধুর হাসি। ভ্রমণ শেষে যখন গৃহে ফিরিবে তখন মেঘের মায়ালীলা অন্তর্হিত হইয়াছে অন্ধকারে—কিম্বা জ্যোৎস্নায়।

আশ্বিন আসে—আসে

স্বচ্ছ সবুজ উত্তর দিগন্তে এক স্নিগ্ধ নীল শ্যামবর্ণা অতি-সুগঠনা দিব্যাঙ্গনা, দক্ষিণ পদটি ঈষৎ মাত্র বাড়াইয়া লীলাভরে বসিয়া আছে,—উদ্ধত নয়, দৃপ্ত নয়,

শান্ত মনোরম ছবি। মাথায় সুকুঞ্চিত কেশের তরঙ্গ অতি সুস্পষ্ট, বেণীবদ্ধ কবরী ঈষৎ শিথিল। নির্মল কপাল—দীর্ঘ সুগঠিত নাসিকা অমনি স্থির স্পষ্ট মূর্তি দেখিয়াছ গ্রীক শিল্পের ভাস্কর্যে। কিন্তু আকাশে এমন অপূর্ব নারীরূপ কখনো দেখি নাই। এতই সুস্পষ্ট যেন এখনি বঙ্কিম গ্রীবাটি ফিরাইয়া চাহিবে। ও মূর্তি প্রাগৈতিহাসিক যুগেব, দ্বাপরের সপ্তহস্ত পরিমিত? না—তার চেয়েও বড়, ত্রেতার চতুর্বিংশতি হস্ত পরিমাণ দেহলতাটিতে স্নিগ্ধ নীল বসন রেখায় রেখায় ভাঁজে ভাঁজে সুবিন্যস্ত। বাতাসে একটুও চঞ্চল বা বিপর্যস্ত নয় সে বসন। দিবাশেষে উপবনে সরোবর তীবে নিশ্চিন্ত মনে বসিয়াছে পীত গোলাপী মেঘের আসনে। সম্মুখে পিছনে স্তরে স্তরে সজ্জিত মেঘ, যেন ডালাভরা ফুলের রাশি চারিদিকে—তাহারই মধ্যে শান্ত ভঙ্গীতে বসিয়া মেঘলোক বিহারিণী, ধীরে ধীরে কবরী খুলিয়া দীর্ঘ বেণী নামিল পিঠের উপর। কোথা গেল আজ সেই অতিকায় ভল্লুক কুম্ভীর কূর্ম? ঐ সুন্দরীর আশে পাশেইতো তাহাদের মানায়। কে তুমি বরাঙ্গনা, তুমি কে? তুমি তো তিলোত্তমা রম্ভা নও—সে ভ্রূভঙ্গী, বক্র কটাক্ষ, মোহন ভঙ্গী, সগর্ব মৃদু হাস্য তোমার নাই। সন্ধ্যান্তে কোথায় কোন প্রাসাদটিতে তুমি ফিরিয়া যাইবে?

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। মধ্য নীলাকাশে থরে থরে অচল শুভ্র তরঙ্গ আকাশ জুড়িয়া আছে। সে ঢেউ, চঞ্চল নয়—বৃহৎ নয়, নদীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালার ন্যায়—কিন্তু অচঞ্চল স্থির। যেন শুভ্র ফেনশীর্ষ তরঙ্গমালা নীল সমুদ্রের সহিত তুষার কঠিন রূপে জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে।

উত্তর-শোভনা আর নাই! কখন পলায়ন করিল? অর্ধ রাত্রিতে মেঘ-প্রাসাদ অলিন্দে দেখা দিবে কি আর?

কে বলে প্রাগৈতিহাসিক যুগের অতিকায় প্রাণীর অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে? আপন আকৃতি—আপনার আকার লইয়া তাহারা মিশিয়া আছে আকাশের মেঘে মেঘে—অরণ্যের শাখায় পত্রে পল্লবে, পর্বতের কঠিন গাত্রে শিলা-লিখিত

রেখায় রেখায়। একদা যে সৃষ্টি সম্পূর্ণ হইয়াছিল ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যেই তার চির স্থিতি। কিন্তু দিগন্ত শোভনা হে সুন্দরী! সায়াহ্ন আকাশ ধন্য করিয়া আর একবার আসিবে কি? সেই সেদিনের মত মেঘের আসনে? আমি তোমার কৃপা কটাক্ষ ভিখারী নই, কিন্তু আর একবার দেখিতে চাই।

দিবালোক মিলাইয়া গেল। গগন-প্রান্তশোভী জলদজাল উজ্জ্বল বর্ণ ছাড়িয়া ক্রমশঃ ঘোর রূপ ধরিতেছে। কমলা গোলাপী, ক্রমে ক্রমে পাটল রক্তাভ ঘোর লাল হইয়া উঠিল। পশ্চিম-উত্তর কোণে একটা বৃহৎ মেঘবর্ণ ভল্লুক বসিয়া আছে, ভঙ্গী হিংস্র নহে—শান্ত।

ঐ সীমাহীন অনন্ত নীলরূপের মধ্যে সমস্ত মায়ারূপ, মেঘের সর্ব বিচিত্র সৌন্দর্যের অতুলনীয় ইন্দ্রজাল-মায়া সমস্ত বর্ণের লীলা-বিলাস একে একে ধীরে ধীরে মিশিয়া বিলীন হইয়া যায়। চিত্রপট অনন্ত অবিনশ্বর—চিত্রলীলা ক্ষণস্থায়ী।

দক্ষিণ দিগন্তে ঘোর সিন্দুর কুঙ্কুমবর্ণের সহস্র সহস্র সূক্ষ্মরেখা ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সূর্যদেব অন্তর্হিত। পাশাপাশি দুইটি সরল বিস্তৃত সুদীর্ঘ পথ পড়িয়াছে, একটি সাদা অপরটি গোলাপী।

রাত্রি প্রায় প্রহরেক। ধূসর কালো মেঘে আকাশ ঢাকা। একটিও তারা নাই, স-জ্যোৎস্না চন্দ্রও অদৃশ্য। চারিদিক অন্ধকার।

সহসা পশ্চিম-দক্ষিণ কোণ হইতে পূর্ব-দক্ষিণ কোণ পর্যন্ত প্রায় অর্ধ আকাশ জুড়িয়া ঘোর পীতবর্ণ হইয়া উঠিল, চারিদিকের কালো রূপের মধ্যে এই অদৃষ্টপূর্ব ভীতিজনক দৃশ্য অন্তরীক্ষ-উৎপাতের পূর্ব লক্ষণ। বাতাস নিশ্চল—স্তম্ভিত। সমস্ত প্রকৃতি নিস্তব্ধ। সচকিত পক্ষীজগৎ আনন্দ কলরব ভুলিয়া আজ নিস্তব্ধ। উহারা তোমার সংবাদপত্রের ভাষার রিপোর্ট পড়িয়া সতর্ক হইতে জানে না। বিধিদত্ত ক্ষমতাবলে আমাদের বহুপূর্বেই সতর্ক হইতে জানে। জানি না শুধু আমরা। তাই পদে পদে একে অন্যের

সাহায্য লই, যন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করি। বৃথা কেন খড়ি পাতিয়া গণনা? কেন এই পণ্ডশ্রম? কতটুকু জানিয়াছ—কতটুকু জানিবে? জ্ঞানের অহঙ্কার বিসর্জন দিয়া স্বাধীন মুক্তির আশ্রয় লই এসো।

গভীর গম্ভীর রাত্রি, নিস্তব্ধ-ঘোর নিস্তব্ধ। ঝোপে ঝাড়ে লুকানো নিশা-বিহারী অরণ্যচারী কীটপতঙ্গকুলের স্বরঝঙ্কারে চৌদিক মুখর, ঝিল্লীর তীব্র রব ক্রমশঃ মৃদু হইয়া আসিতেছে। কিন্তু চারিদিক ভরিয়া অতি অস্পষ্ট ভ্রমরগুঞ্জনবৎ এক অবিচ্ছিন্ন ধ্বনি বাজিতেছে। রাত্রির ঘোর নিস্তব্ধতার সহিত এই সুরের আশ্চর্য মিলন। যখন এই সুরঝঙ্কারের তরঙ্গ খেলিতে থাকে তখনই মধ্য নিশায় গম্ভীর গভীর নৈঃশব্দ্যের পূর্ণ বিকাশ। কর্মচঞ্চল জাগ্রত দিবসে যাহারা নীরব, লোকচক্ষের অগোচরে লুক্কায়িত, বিশ্বব্যাপী অনন্ত চৈতন্যের সহকারী তাহাদেরই কণ্ঠোত্থিত বিচিত্র—মৃদু—তীক্ষ্ণ ঈষৎ করুণ রাগিণী, যেন কোন মহাধ্যানপরায়ণ স্তব্ধ তপস্বীর চরণতলে একছন্দে নিবেদিত বন্দনা গান।

বৃক্ষপত্রমধ্যে শূন্যে শূন্যে, কদাচ তৃণদলে জোনাকি জ্বলিতেছে। স্নিগ্ধালোক ক্ষুদ্র দীপ যেন সসঙ্কোচে জ্বলে আর নেভে। অপার্থিব মহিমাভরে থম্ থম্ করিতেছে ঘোর গম্ভীর রাত্রির ভয়ঙ্কর সৌন্দর্য, অরূপের পূজায় প্রকৃতি বসিয়াছেন এতক্ষণে, বসিয়াছেন অতি কোমল তৃণাসনে, দীর্ঘ তরুদল চামরের মত বায়ুভারে ঈষৎ কম্পিত, ভুবন ভরিয়া বহিতেছে স্নিগ্ধ মৃদু নৈশ-বাতাস-ব্যজনী। বৃক্ষশোভী গুচ্ছ গুচ্ছ পুষ্পপত্রদলের চিরসজ্জিত পূজাভার-নৈবেদ্য। এই মহামহিমময় পূজা, এই নৈবেদ্য, এই নীরব নিবেদন চলিয়াছে চিরদিন—চিরযুগ—চিরকাল। বিরাম নাই—বিশ্রাম নাই—শেষ নাই।

অর্ধ রাত্রি। পক্ষীকুল ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, সেই ঝঙ্কারে মিশিল শিবা-দলের ঐক্যতান। অপূর্ব সুরসঙ্গতি। দুর্জ্ঞেয় সৃষ্টিরহস্যের সহকারী মানবেতর প্রাণী। বিশ্ব নিয়ম-বিধি মানিয়া চলে শুধু ইহারাই। ঐ তো

প্রহরে প্রহরে আমাদিগকে জানাইয়া দেয়—সজাগ করে, সতর্ক করিয়া সচেতন হইতে বলে, কিন্তু কোথায় সে চেতনা কোন মোহাচ্ছন্ন অন্তর স্পর্শ করে? শ্রান্ত নিদ্রিত মানব যখন মোহঘোরে আচ্ছন্ন—সেই মহাক্ষণে ভূলোকে দ্যুলোকে ধীরে ধীরে একের পর এক দৃশ্যের পর দৃশ্যের প্রকাশ। শতবর্ণ বিচিত্রতার লীলাবিলাস নয় এ, গম্ভীর মহিমময় অলৌকিক রূপের পরম বিকাশ।

অপার্থিব মায়াজাল-ঘেরা কোন অপার্থিব দেশ এ? এই রহস্যাবৃত ঘোর নিস্তব্ধ ভয়ঙ্কর রূপের মধ্যে কোথায় আমাদের চিরপরিচিত চিরপ্রিয় উজ্জ্বল মধুর হাস্যময় উন্মুক্ত মুখর পৃথিবী ও আকাশ?

দিবস মায়া,—রাত্রি সত্য।

ক্ষণে উচ্চ, ক্ষণে মৃদু, ক্ষণে তীব্র, ক্ষণে শান্ত শত শত বিচিত্র অবিচ্ছিন্ন রাগিণী-ঝঙ্কার চারিদিকে, তাহারই মধ্যে ঘোর নিশার অখণ্ড অলৌকিক নিঃশব্দতা অলৌকিক মহিমাভরে চির অক্ষুন্ন।

—'আমি রূপ-সায়রে ডুব দিয়েছি অরূপ রতন আশা ক'রে।'

মেঘহীন নির্মল সুপ্রসন্ন গম্ভীর নীলকান্তি মহাকাশপটের মধ্যভাগে প্রসারিত স্নিগ্ধোজ্জ্বল দীপ্তিশালী ছায়াপথ। ছায়াপথ—দেব সরণী।

বনকাকলী

দুষ্ট বনমালী সুখময়ীকে বড় জ্বালাতন করে,—গাছের ডালে নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া আছে। সুখময়ীর করুণ আবেদন শোন!

'তুই যা উড়ে—দেখে আয় আমার গিরিবালা কেমন আছে। তার তো ভাড়া লাগবে না—গাছের ফল—নদীর জল—তোর ভাবনা কি? আমায় খবর এনে দে—'

কথা শিখিয়াছে বনমালী অনেক—'কে' 'ওকি?' 'পোকা' 'যা-যা' 'কোথায়?'

পাশ্চিত্রা চব্বিশপরগণাবাসিনীর উত্ত্যক্তকণ্ঠ 'ঠোঁটে করে সব ছাতু দিলে ছিটিয়ে—বলে কিনা পোকা পোকা! শুনতে পেয়েছ ওর কথা? আমায় বল্‌ছে তুই যা-তুই যা—'

তবে বনালীর কথা সুখময়ী যেমন স্পষ্ট বোঝে—ততটা আর কেহ নয়।

সন্ধ্যা না হইতে বনালী ভয়চকিতভাবে এদিক ওদিক চায়, বার বার ঊর্ধ্ব-দৃষ্টিতে কি দেখে সেই জানে, হয় ত আসন্ন অন্ধকারের আভাসে কেমন করিয়া দিনের আলো নিভিয়া যায় তাই কি এত ভয়? উড়িয়া উড়িয়া মাথায় বসে—সুখময়ী ডাকে 'আয় আয়'—ভীরু পাখীটি ক্রমে কাঁধ হইতে নামিয়া খাঁচায় প্রবেশ করে।

এক একদিন কিছুতেই ধরা দেয় না—নাকাল করিয়া ছাড়ে। এদিক ওদিক করিতে করিতে হঠাৎ উড়িয়া একটি নিভৃত উচ্চস্থানে গিয়া বসে এবং সেইখানে রাত্রি কাটে। বাহিরে তাহাকে রাখিয়া ঘরে যাইতে সুখময়ীর মন সরে না—কতবার নিচে দাঁড়াইয়া ডাকে—'উলে আয় বনালী উলে আয় আর কষ্ট দিস্‌নি লক্ষ্মীটি—'

ডাক শুনিয়া বনালী আকুলি-বিকুলি করিয়া চারিদিকে চায়।

দিনের আলো ফুটিবার সঙ্গে সঙ্গে বনালী খাঁচা হইতে ছুটিয়া বাহির হইল—ঘরে ঘরে খোঁজ-খবর তদারক পাখা ঝটপট ইত্যাদি প্রাতঃকার্য সমাধা হইলে উচ্চ-স্থানে গিয়া বসিল—নিচুতে বসে না সে—তারপরে খাইবার পালা—নিজে খাইতে শেখে নাই, ছাতুর গুলি খাওয়াইয়া দিতে হয়। তখন সুখময়ীর সঙ্গে বিষম ঝগড়া বাধিয়া যায়। এক একদিন বনালী ছুটিয়া চলিয়া আসে—সঙ্গে সঙ্গে সুখময়ীর নালিশ—দেখলে! দেখলে, দেখলে? উঠে পড়ে আমায় নাতি দে পালালো!

সে আমি দেখিয়াছি—একখানি পা বাড়াইয়া বার বার সুখময়ীর হাতে আঘাত করা।

সহজাত সংস্কারে স্নানের অভ্যাস ঠিক আছে—তিনবার স্নান করে, সকালে দুপুরে এবং সূর্যাস্তের কিছু পূর্বে। অন্য পক্ষীর মত নদী বা অপর জলাশয়ে স্নান করিতে যায় না—গাছতলায় রক্ষিত এক কটাহ জলে স্নান করে। প্রথমে কটাহের চারিদিক দুই তিনবার প্রদক্ষিণ করে—পা ডুবাইয়া দেখে—চক্ষুদ্বারা স্পর্শ করিয়া পরীক্ষা করে—পরে পাখার ঝাপটা কাটিতে কাটিতে মহানন্দে অবগাহন,—সুখময়ী বলে 'গণ্ডী কেটে নাইবে!'

স্নান শেষে উড়িয়া উঁচু জায়গায় বসিয়া পাখার ঝাপটায় সর্বাঙ্গের জল ঝাড়িয়া ফেলে। একদিন জলে হলুদ মিশাইয়া দেওয়া হইয়াছিল—বনালী ঘুরিয়া ঘুরিয়া একবার মাত্র চঞ্চু ডুবাইয়া দেখিয়া চলিয়া আসিল—আর সে জল ছুঁইল না।

বনালী বড় একাকী—কত শালিক ঘাসের বনে আহার খুঁজিয়া বেড়ায়, সারাদিন কত ঝগড়া কত কাকলীতে তরুতল তরুশাখা মুখর করিয়া রাখে—বনালীকে দেখিবামাত্র আক্রমণ করে। বনালীর জলে স্নান করে তারা—ভয়ে বনালী পলাইয়া আসে, সুখময়ী বন্য শালিকদল তাড়াইয়া দিয়া দাঁড়াইলে তখন নিশ্চিন্ত হইয়া বনালী জলে নামে।

সাথীহারা প্রাণীটি মানুষের সঙ্গে বাস করিয়া মানব প্রকৃতি ধরিয়াছে সেইজন্য নিজ সমাজত্যক্ত। দুপুরবেলা ঘুমন্ত পালয়িত্রীর চুল চঞ্চুপুটে টানিয়া ঘুম ভাঙায়, যতক্ষণ প্রিয় খাদ্য-কণিকা না মিলিবে নিস্তার নাই, সকল সময় সর্বঘটে অবতীর্ণ বনালী। একখানা বই পড়িতে দেয় না, মুখ দেখিতে না পাইলে ছড়ানো সংবাদপত্র টানিয়া ছিঁড়িয়া আক্রোশভরে কুটিকুটি করে—হাতের উপর বসিয়া অনিমেষ চাহনীতে মুখের দিকে চাহিয়া থাকে। আয়নায় বসিয়া প্রতিবিম্বিত প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে বিষম কলহ বাধায়। একদিন একটি সূতার গুলি লইয়া উড়িয়া গিয়াছিল—সমস্ত ঘাসের বন জুড়িয়া সূতার গোলকধাঁধা—এবং তাহার মধ্যে নিজেও জড়াইয়া গিয়াছে।

ঝম্ ঝম্ বৃষ্টির শব্দে ঘরের ভিতর লুকায় ভীরু, নিজ সীমানা ছাড়িয়া বাহিরে যায় না—অপ্রিয় যে—কাছ ঘেঁসিবে না।

এক একদিন সুখময়ীর সঙ্গে ঝগড়া করিয়া গম্ভীরমুখে কোন সুউচ্চ শাখায় ঘন পত্রের মধ্যে লুকাইয়া থাকে—খোঁজ পড়িয়া যায়। নাম ধরিয়া ডাকিবামাত্র অতি চঞ্চল গতিভরে তীক্ষ্ণ কাকলী ছাড়িয়া উড়িয়া নামিয়া গায়ে ঝাঁপাইয়া পড়ে। তারপরে সর্বাঙ্গে চঞ্চু ঘসিয়া আদর, সোহাগ, আলাপ, মন দিবে না? বনালী তোমার মন ফিরাইতে জানে।

বনালী উচ্চ ভীত চীৎকারে অপরিচিতের আগমনবার্তা জানায়। হোক সে মানুষ বা পশু—"এ কে—এ কি—এ কে—এ কি!"

অর্থাৎ কেন আসিল এ উৎপাত!

বার বার পলায়—বার বার মাথা বাড়াইয়া দেখে চঞ্চল চক্ষু ছুটি চাকার মত ঘুর্ণায়মান—ঘাড় ফিরাইয়া ঘুরাইয়া পর্যবেক্ষণ,—তীক্ষ্ণস্বরে নালিশ—আগন্তুককে তিরস্কার—বিষম কাণ্ড বাধিয়া যায়।

এবং তার পরে—যদি সুবিচার না হয়—অর্থাৎ আগন্তুক বিতাড়িত না হয়—অভিমানী বনশিশু হঠাৎ উড়িয়া গিয়া বকুল ডালে ঘন পাতার আড়ালে লুকাইল,—এই তাহার একমাত্র অস্ত্র।

কোন ডালে?—কোন গাছে? কোথায়?—কোথাও তো নাই,—নিঃশব্দ সর্বত্র। গোলমালে গাছ হইতে কাক শালিক চড়ুই একে একে সরবে উড়িয়া কেহ দূরে পলাইল, কেহ অপর গাছের ডালে গিয়া বসিল,—পক্ষী-জগৎ অসাময়িক গণ্ডগোলে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে,—দূর হইতে এদিক ওদিক হইতে পক্ষীরা উড়িয়া উড়িয়া আসিয়া দেখিতেছে,—নীচে উর্ধ্বমুখ উৎসুক উদগ্রীব বনালীর শত্রু সারমেয় মার্জার।—হয়তো এই সঙ্কট মুহূর্তে বিপদ ভুলিয়া সহানুভূতি জাগিয়াছে তাহাদের হিংস্র মনে। চারিদিকে এত ব্যস্ততা—কিন্তু কই সে সুচতুর মায়াবী?

সন্ধ্যা নামিয়া আসে।—পালকের সভীত উচ্চ আহ্বান ঈষৎ রুষ্ট হইয়া উঠে।—সুখময়ীর ক্ষীণ মিনতি—

আয় বাবা আয়—লক্ষীটি এসো—কিচ্ছুটি বলবনিকো,—এসো—

আরো কিছুক্ষণ। যখন পত্ররাশির মধ্যে অন্ধকার ঘনায়মান হইয়া উঠিল,—সহসা এক তীক্ষ্ণ হর্ষ কাকলী,—এবং বনালী সুখময়ীর কাঁধে বসিয়া চঞ্চুপুটে সুখময়ীর কানে কাঁধে মাথায় অবিরাম আঘাত করিতেছে।

বনের মায়া

নীল মেঘ প্রাচীর ভাঙিয়া চাঁদ উঁকি দিয়াছে। দিগন্তে দিগন্তে ধূম্র নীল মেঘবৎ তরু শ্রেণী,—ও কি ধূমলেখা না কুয়াসা ?

অর্ধ রাত্রি।—টি—টি—টি,—নদীকূলবাসী নিশাচর পক্ষী নদীভ্রমে জ্যোৎস্নাধৌত শুভ্র প্রান্তরে উড়িয়া পড়িতেছে।—ও-পারে শালবনরেখা ছায়ামগ্ন নদীতীরবৎ—মধ্যে নিস্তরঙ্গ নদীর মত চন্দ্রালোক-প্লাবিত শুভ্র প্রান্তর—টিট্টিভের তীক্ষ্ণ উচ্চস্বর গভীর নিশার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছিল—টি—টি—টি—

হায়,—কে গৃহবাস করিতে পারে? মায়াবিনী প্রকৃতি ইন্দ্রজাল মন্ত্রে কেশাকর্ষণ করিয়া বনবাস দিতে চায়! ঘরের চেয়ে গাছতলা ভাল—ছাদের চেয়ে প্রান্তর ভাল—সংসারের চেয়ে অরণ্য ভাল।

বৃক্ষ—বৃক্ষ—বৃক্ষতল।—মুকুট ফেলিয়া সিংহাসনাধিকারী যেখানে আশ্রয় লয়—চারিদিকে অবাধ শান্তি ও উন্মুক্ত স্বাধীনতা যে বৃক্ষতলে,—

খর দ্বিপ্রহরে তপ্ত অগ্নিসম বায়ুমণ্ডলমধ্যে স্নিগ্ধ বৃক্ষতল,—রৌদ্রের ভিতর দিয়া অতি শীতল মৃদু বায়ু আসিয়া গায়ে লাগিবে সেই বৃক্ষতলে।

কম্পমান শীত কালে উষ্ণ বৃক্ষতল—

চারিদিকের তীক্ষ্ণ হিম বায়ুর মধ্যে

শুষ্ক তৃণকোমল সুশোভিত বৃক্ষতল।

আর ঐ আকাশ-সাগরে ভাসমান নিবিড় মেঘের বিচিত্র চিরন্তন রূপে কত ধূম্রবর্ণ উন্মুখ ধাববান প্রাণী,—কত উৎসুক উড়ন্ত শ্বেত পক্ষী—বিকট ভঙ্গীতে প্রকট কত উদ্ধত কৃষ্ণবর্ণ জন্তু। ঘনকৃষ্ণ মেঘখণ্ডের প্রান্তদেশ দিনে কতবার বিচ্ছুরিত সূর্যরশ্মিতে পীত শ্বেত রক্তবর্ণে রঞ্জিত হইয়া ভয়ঙ্কর

বেশ ধরে। কত দীর্ঘচঞ্চু বক্রগ্রীব অতিকায় জীব দিকে দিকে উদগ্রীব হইয়া আছে। তাহারি তলে শালবন-মধ্যে অটল সীমান্তরক্ষীদল, উদাস প্রান্তর ব্যাপিয়া স্থানে স্থানে স্থির—প্রান্তর সৈনিক—সেই সৈনিকের পদপ্রান্তে আশ্রয় লয় রাখাল ও গো-পাল। অদূরে সেই বীর-সজ্জায় সজ্জিত সেনাপতি,—তেমনি অধোমুখ-চিন্তিত।

কিন্তু একদিন—যেদিন শরৎ অন্তে হিমানী আসিয়া সমস্ত সবুজশ্রী ম্লান করিয়া দিবে, প্রান্তরের শুষ্ক বন্যলতা এবং বন্য গুল্মরাশি কাটিয়া লইবে বন্য বালিকা দল, যখন প্রভাতের স্বর্ণ আভার পরিবর্তে পীতাভ ও রৌদ্র জাগিবে—শ্বেত শুভ্র আভা বিকীর্ণ করিয়া সূর্যদেব প্রথম দর্শন দিবেন—সন্ধ্যার রক্তরশ্মি আর আকাশ জুড়িয়া রঙের খেলা খেলিবে না—যখন প্রভাতে দেখিব চারিদিক কুয়াশায় ঢাকা—আর সন্ধ্যায় ধূমাচ্ছন্ন বনালী সেই দৃশ্য কে চাহিবে দেখিতে ?

সেদিন—যখন উন্মাদ বায়ু শোঁ শোঁ রবে গর্জিয়া ছুটিবে, পক বৃক্ষপত্র ঝরিয়া উড়িতে থাকিবে, পক্ষীকুলকে নীরব করিয়া দিবে সেই পাগল হাওয়ার আকুল চীৎকার ধ্বনি,—তখন নিরুৎসাহ গো-বৎস বিচরণ করিবে তৃণরিক্ত প্রান্তরে এবং ধূলিজালে ও কুয়াসায় শ্যাম প্রাচীর ঢাকা পড়িবে, তখন দেখা দিবে বটে আম্র-মঞ্জরী—কিন্তু উদয় অস্তের কাঞ্চন রক্তিমাধারার তীক্ষ্ণ পীতাভ জ্যোতি,—তার আগে আমিও যাইব এখান হইতে।

দেখিও তখন বিরলপত্র বিল্ববৃক্ষে অদ্ভুত বিল্বফলসম্ভার বকুল বৃক্ষে লোহিতবর্ণ বকুল ফলরাশি,—তখন নব নব ফলভারে বৃক্ষবল্লরী সমৃদ্ধ হইবে বটে—কিন্তু পত্রসজ্জারিক্ত শ্রীহীন অঙ্গে নবীন ফুল, নবীন মুকুল, নবীন ফল বহন করিয়া কি লাভ ? মূল্য কি তাহার ? সার্থকতা কোথায় ?

আর ঐ বিশাল শালতরু—কোমল কিশলয় যার রক্তপ্রভ—পক্কপত্র-রাশি আরক্ত, দৃপ্ত নব যৌবনে যে অতুল সবুজশ্রীমণ্ডিত,—সেই বনস্পতি ক্রমে ক্রমে পত্রহীন হইতে থাকিবে—তার পূর্বে এখান হইতে বিদায় শ্রেয়।

(ঐশ্বর্য এবং সৌন্দর্য এক নহে—তরুলতার সার্থকতা শ্যাম সবুজ রূপে—নব-যৌবনে,—সেই তাহার গৌরবান্বিতকাল।)

এবং তার পূর্বে রচনা করিয়া রাখ স্নিগ্ধ আকাশের তলে গিরি-সানুদেশে নির্ঝরতীরে একটি পত্রাচ্ছাদিত লতাগৃহ।

জ্যাকের বন্ধু ফিরিয়া আসিয়াছিল কি? এখনো কি সেই ক্ষুদ্রকায় আত্ম-বিশ্বাসী চঞ্চল প্রাণীটি পর্বতের শিখরে কন্দরে নিম্ন জলাভূমিতে—সমুদ্র তীরে গহন অরণ্যে বন্ধুটিকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে? সরল বিশ্বাস আত্মবিস্মৃত ভালবাসার একমাত্র পাত্রটিকে ফিরিয়া পাইয়াছ কি? জানিতে বড় সাধ হয়। বর্ষা কুজ্ঝটিকা শেষে যখন নবপত্রে মুকুলে কিশলয়ে পুষ্পে প্রতি বৃক্ষবল্লরী নব-যৌবন-বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল—তখনো কি সে ফিরে নাই? কবে ফিরিবে? আর ফিরিবে কি?

অর্ধ দক্ষিণ অর্ধ পশ্চিম এ তোমার বঙ্গদেশ নহে। সমতল পল্লীতে মসৃণ আঁকা বাঁকা পথ—শস্যভারশালী উর্বর ক্ষেত্র অথবা হরিৎ তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তরের ভিতর দিয়া যে সরল অথবা বক্র পল্লীপথ গিয়াছে, বিল খাল পুষ্করিণী-তীরের পথ—যে পথে সলজ্জ-নয়না পল্লীবধূ কলস কক্ষে যাতায়াত করে। প্রায় সাগর সদৃশ উত্তাল তরঙ্গশালী প্রখরস্রোতা নদী, যে নদীতে ভাসমান বৃহৎ জলজন্তুবৎ বাষ্পীয় যান ধূমরাশি ছাড়িতে ছাড়িতে সগর্জনে দিগ্‌বিদিকে ছুটাছুটি করে। যে নদীতে প্রভাতে সন্ধ্যায় রক্তরাগরঞ্জিত বিচিত্র বর্ণের পাল উড়াইয়া অগণ্য তরণী ভাসিয়া যায়। যে বঙ্গদেশে নতশীর্ষ বেণুবনে নিম্নভূমিতে ঝোপে ঝাড়ে সঙ্কীর্ণ পথে সর্বত্র সলজ্জ সঙ্কোচ ভাব—সর্বত্র আনত নম্রতা—এ সেই দেশ নহে। বঙ্গদেশের মৃত্তিকা কোমল, সর্বত্র কোমলতা।

এই অর্ধ পশ্চিম অর্ধ দক্ষিণ দেশের মৃত্তিকা রুক্ষ কঠিন—পাটল কঙ্করযুক্ত কোথাও ম্লান গৈরিক—কোথাও উজ্জ্বল গৈরিক কোথাও বা আরক্ত। বিস্তীর্ণ অনুর্বর প্রান্তর কিংবা ঘনায়মান বন, বনানী ঊর্ধ্বমুখ অসঙ্কোচ—বনপত্র

অতি প্রশস্ত স্বচ্ছন্দে বনভোজন করিতে পার—কিন্তু জলাশয়ের অভাব। এখানে বনমধ্যে উচ্চ বল্মীক-স্তূপ, বন্যপ্রাণীবিবরসঙ্কুল এবং অপরিচিত লতা-বৃক্ষে অপরিচিত ফুল ফল। গভীর রাত্রে উন্মুক্ত প্রান্তরে কোন অপরিচিত নিশাচর বনালয় ছাড়িয়া বাহির হইয়া আসে এবং উচ্চ ভীষণ রবে চতুর্দিক মুখরিত করিয়া দেয়, সে চিত্তত্রাসকারী ধ্বনিতে দুর্বল প্রাণীকুল সভয়ে বনে বিবরে লুকায়। এ দেশে বন্যবালা নির্ভীক অসঙ্কোচে তোমার দিকে চাহিয়া দেখিবে—বঙ্গবালার ন্যায় গুণ্ঠন টানিয়া মুখ ফিরাইবে না। এ দেশে লজ্জাবতী লতা বঙ্গদেশের ন্যায় স্পর্শভীরু নহে। এ দেশের সর্বত্র উচ্চ, প্রশস্ত, অনাবৃত, উদার, উন্মুক্ত এবং কঠিন। এবং ক্রমে অগ্রসর হও যদি অচিরে সর্ব-রত্নের আকর সীমাহীন অকূল সমুদ্রসান্নিধ্য মিলিবে।

কিন্তু আরো দূরে—ক্রমে দূর হইতে দূরে, দক্ষিণ হইতে পশ্চিমে অথবা পূর্ব হইতে উত্তরে—দিনের পর দিন বনপ্রান্তর নদীপর্বত অতিক্রম করিয়া সপ্ত ঋষির ন্যায় সমগ্র বসুন্ধরায়, সর্বত্র দুরারোহ গিরিমালার পার্শ্বে অধিত্যকায় অথবা শিখর হইতে শিখরান্তরে কিংবা একতটশালী অনন্ত সাগরের কূলে কূলে, অথবা সাগর পার হইয়া নিরুদ্দেশ অভিযান যাত্রা করিবে কি? যে ভ্রমণ উচ্চাভিলাষীর দিব্য আনন্দদায়ী এবং অনন্ত অনুসন্ধিৎসা যুক্ত। ভ্রান্ত বনবাসী, সেই পথ ধরিবে না? নেত্র মেলিয়া চাহিবে কবে?

বিজ্ঞানালোক-অন্ধ অহঙ্কারী মানব—কি তোমার জ্ঞান? কতটুকু সীমা? বিশ্বের দুর্জ্ঞেয় রহস্য তুমি এক বিন্দু জানিতে পারিয়াছ কি? বার বার তোমার প্রাণান্ত অভিযান ব্যর্থ হয় নাই কি? সপ্তসাগরশালিনী সপ্তদ্বীপ-ভূষণা মাতা বসুন্ধরার একটি কণিকাও চিনিতে পার নাই। পারিবে সে আশা রাখিও না।

কেন আর গৃহবাস? চল বনে যাই। যে বনে বনালী আসিয়া আপনি ধরা দেয়।

বন্দীবাসে জগজ্জননীর পূজা

সুদক্ষ শিল্পী মিলিল না,—কিন্তু ক্ষতি নাই,—নিজেরা এক এক জন ময়দানব।

মন্দির পূর্ণ হইয়া গেল রাশি রাশি শ্বেত নীল পীত লোহিত কুসুমদামে,—পূজা উপকরণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ফুল—সেই ফুল অগণ্য অসংখ্য অপর্যাপ্ত। যদিও রুক্ষ দেশ—কিন্তু চেষ্টার অসাধ্য কি আছে?—সুতরাং পরম উল্লাসে সন্তানেরা কত বিচিত্র অলঙ্কার গড়িল সেই সব দিব্য সৌরভময় পুষ্পগুচ্ছে,—এবং সেই অলঙ্কারে আপন অভিলাষ অনুযায়ী মাকে সাজাইল—অপূর্ব অতুলনীয় সে রূপসজ্জার শোভা।

ঘণ্টা ভিন্ন অন্য বাদ্য নিষেধ। তাতেই বা কি? এত ক্ষমতা যাদের, মনের মত বাদ্যযন্ত্র গড়িতে পারিবে না? যদিও ঘণ্টা সর্ববাদ্যময়ী—কিন্তু মানিবে কেন?

ধাতুপাত্রের বাদ্য শুনিয়াছ কি? পিতল কাঁসার বড় বড় থালা ছোট মাঝারি রেকাব-ডেকচি নানা আকারের নানা ধাতু নির্মিত হাল্‌কা ক্ষুদ্র হইতে বৃহৎ ভারী ভারী প্রত্যেকটি পাত্র হইল বাদ্য যন্ত্র। প্রকাণ্ড টিনের পুরু জলাধারের মুখে মোটা কাগজ আঁটিয়া ঢাক তরি—সেই ঢাকের গুরু গম্ভীর নিনাদ!—যন্ত্র অভিনব, সুর অভিনব, কিন্তু অতি সুসঙ্গত তাল লয় মান যুক্ত সুনির্দিষ্ট সুর। সমস্ত বিখ্যাত বাদ্যযন্ত্রকে পরাস্ত করিয়া দিল এই সম্পূর্ণ নূতন অভিনব সৃষ্টি।

গম্ভীর-কোমল—উচ্চ-মৃদু উদাস-করুণ-মধুর-সপ্তস্বর একসঙ্গে বাজিতে লাগিল সুনিপুণ শিল্পীদলের হাতে।—নির্দোষ সম্পূর্ণ অশ্রুতপূর্ব সে সম্মিলিত স্বরগ্রামের মূর্চ্ছনা ক্ষুদ্রতম নগরীটিকে প্লাবিত করিয়া চারিদিকের প্রান্তরে বনে ছড়াইয়া গেল।—সেই সাতটি সুর একত্রে মিশিয়া অন্তরীক্ষে উঠিয়া ভাসিতে ভাসিতে ঊর্ধ্বে আকাশে চলিল। যেন দেবর্ষি নারদের সপ্তস্বরা বীণাটির সব কয়টি তার একসঙ্গে বাজিতেছে।

সুন্দর প্রভাত! সুন্দর পৃথিবী—সুন্দর আকাশ। অসুন্দর কে?—মানুষ! নহিলে এমন শান্ত বনালয়ে কারখানা বসায়?

ঐ দক্ষিণে শিয়াল চলিল শালবনের পথে, একটি কুকুর দাঁড়াইয়া আছে। প্রান্তররক্ষীর তলায়, শিকার-আগ্রহ নাই, শুধু চাহিয়া দেখিতেছে। পাখীর দল নামিয়াছে মাঠে —তৃণশস্য কিম্বা কীটপতঙ্গ খুঁটিয়া খুঁটিয়া ধরে, কেহ নিজে খায়, কেহ শাবকের মুখে দেয়, কেহবা সঞ্চয় করে নিতান্ত শিশুশাবকের জন্য—যে এখনো বাসা ছাড়িয়া বাহির হইতে পারে না।

উত্তরে বন্দীবাসের সম্মুখে ছোট একটা জনারণ্য। একের পর এক ব্যবসায়ীর দল। বন্দীগণের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কতক আসে নিত্য কলিকাতা হইতে—কতক যোগায় খড়্গাপুরের বড় বড় দোকানী। সর্বদার জন্য বন্দীবাসের সম্মুখে বৃহৎ একটি স্থায়ী বিপণি। আসে ভোরবেলা সকলে মিলিয়া জানিতে কোন্ কোন্ প্রয়োজন—কি কি বিশেষ প্রয়োজন। নিত্য আসে অর্ডার লইতে। ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন লোক নিযুক্ত।

দক্ষিণে একদল বন্য রমণী চলিয়াছে শালবনে শুষ্ক কাষ্ঠ আহরণার্থে। উত্তরে সারি সারি সাইকেল চলিল খড়্গাপুরের পথে—কেহ ডাক আনিতে, কেহ বন্দীবাবুদের ফরমাস অনুযায়ী।

দক্ষিণে মৃদুবায়ু-চঞ্চল শালবন, প্রান্তর প্রহরীরা ঈষৎ আন্দ্র কম্পিত—ঊর্ধ্বে নির্মেঘ নীল আকাশ, নিম্নে স্নিগ্ধ সবুজ শালবন, পৃথিবীতে স্নিগ্ধ মধুর অমৃতময় প্রভাত।

উত্তরে হাতিয়ায় সজ্জিত দুইটি শাস্ত্রীর আগে পিছে পাহারার মধ্যে একদল সাধারণ বন্দী জেলের বাহির হইয়া আসিল।

দক্ষিণে বনালী উড়িয়া গিয়া মাঠে পড়িল। সুখময়ী অ' বনালী যামিনি! বোইলে আয়—শ্যাল ঘুরছে · মাগো! দেবে এখুনি অক্তাঅক্তি করে —

শ্যালে অবশ্য অক্তাঅক্তি করিবে না, ধরিতে পারিলে মুখে করিয়া পলাইবে। উত্তরে সকালবেলার কাজ একপালা সারিয়া অফিস হইতে সুবৃহৎ শ্বেতছত্র-

তলে জেলের অধ্যক্ষ বন্দীবাস- পর্যবেক্ষণে স্বয়ং বাহির হইলেন। সঙ্গে কর্মচারিগণ।

দক্ষিণে জোর বাতাসে মর্মরধ্বনি উঠিল বনানীতে—ভয় পাইয়া বনালী প্রান্তর ছাড়িয়া আসিয়া আম্র শাখায় বসিল।

শালবনী

শালবনী।—খড়্গাপুর, গোকুলপুর, মেদিনীপুর, গদাপিয়া শাল। কিন্তু শালবনী,—কি সুন্দর নাম!

শালবনী থানাটি কেন্দ্র করিয়া ক্ষুদ্র একটি নগরের আভাস।

পূর্বদিকে মাঝিপাড়া। একটি পুকুর—পুকুর পাড়ে থানার বড়বাবুর বাসা—বাসার পরে থানা, থানার পরে দেবীমণ্ডপ, ভোগের ঘর ও অন্যান্য কতকগুলি ঘর। তার পরে উত্তর দক্ষিণে লম্বা দোকানপসার। দোকানের সম্মুখ দিয়া উত্তর দক্ষিণে পথ, ঘাঁটাল হইতে মেদিনীপুরের মোটর সার্ভিস এখন প্রায় বন্ধ, পেট্রোল নিয়ন্ত্রণের জন্য। আপদ গিয়াছে। মানুষ পায়ে হাঁটিয়া বাঁচুক, আপন হস্তপদ আপনি অনুভব করুক। শেষে কি যন্ত্রের সাহায্য লইবে অন্নজল মুখে তুলিতে?

পথের ঠিক ও পারে ডাকবাংলোর গেট, এবং বৃহৎ কমপাউণ্ডের মধ্যে বিশাল বৃক্ষাবলী বেষ্টিত ছোট্ট ডাকবাংলো। ডাকবাংলোর সীমা পার হইয়া উঁচু একটা পথ, সেই পথের পরেই স্টেশন। ছোট্ট স্টেশন, কত ট্রেন আসে যায়—কে লক্ষ্য করে নগণ্য এক শালবনী?

স্টেশনের চারিদিক উন্মুক্ত। লাইনের ও পারে বিস্তৃত উচ্চ ও রুক্ষ প্রান্তর। একদিকে কাঠের আড়ত, সম্মুখে ক্রমনিম্ন ধান ক্ষেত। আর একদিকে শালের জঙ্গল। শিশু শালবন নয়, বৃহৎ বৃক্ষশ্রেণীর দুর্ভেদ্য জঙ্গল। কিন্তু সেই বিশাল তৃণহীন প্রান্তরে দাঁড়াইয়া নিজকেও মনে হয় ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র,—তেমনি জঙ্গল, আড়ত, ক্ষেতও দেখিবে গুরুত্বহীন,—অতি সাধারণ।

বহুদিন স্টেশনটির কথা মনে থাকিবে। ঘোর সন্ধ্যায় প্রান্তর হইতে লাইন পার হইয়া ফিরিয়া আসিবার পথে এক বিদেশী রান্না করিতে বসিয়াছে! একটা টিউবওয়েলের পাশে খোলা জায়গায় ইট পাড়িয়া উনান। একখানি ইট, বসিবার পিড়ি। ক্ষুদ্র একটা বিছানা এক পাশে। শুকনো ডালপালায় উনান জ্বলিতেছে। উনানে ঘটিতে ডাল চড়ানো। একখানি ছোট তাওয়ায় ময়দা মাখা। একটা পিতলের বাটিতে জল। কাগজে মশলার গুঁড়া—শিশিতে ঘি। এক পয়সার ছোট্ট একটা কুপি পাশে,—এখনো ধরায় নাই—স্টেশনের আলোতে কাজ চলিবে। বিদেশী হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ। ঘড়ি-সারাই ব্যবসা। বিছানার নীচে একটা ছোট স্যুটকেসে যন্ত্রাদি। আর সামান্য দিনপাতও সংক্ষেপ। কারো অতিথি হয় না—আশ্রয় ভিক্ষা করে না—সাহায্য চায় না। সারাদিন স্টেশনে কাজ করিয়াছে, নূতন জায়গায় কিছুমাত্র অসুবিধা হয় নাই। মনে পড়িল—আসিবার সময় পথের ধারে দেখিয়াছিলাম একটি ছোট বাক্স ও বিছানা।—বলিয়াছিলাম কার জিনিস এ? কে ফেলে গেল?

'কোথা গিয়েছিলে তুমি?

'দোকানে জিনিস কিনতে'—

'যদি কেউ তোমার জিনিসপত্র চুরি করতো?'

নিশ্চিন্ত হাসি বিদেশীর মুখে, কে নেবে?

'এসব জিনিস-পত্র কিসে করে নিয়ে বেড়াও?'

'বিছানায় বেঁধে।'

'থালা কই তোমার?'

'তাওয়া আমার থালা।'

'জল পাবে কোথা?'

'এই যে—জলের কাছে আমি। জায়গা বেছে নিই।'

বিদেশী টিউব ওয়েলটা দেখাইল। সন্ধ্যার অন্ধকারের আগে দেখি নাই সেট।

'রাত্রে থাকবে কোথা ? '

'স্টেশনে থাকবো। শান্ত প্রফুল্ল স্বভাব বিদেশীর। কিছু ভাবনা-চিন্তা নাই, অথচ সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক হইয়া আছে।'

'অসুবিধে হয় না তোমার ?'

'কিছু না। চিরকাল বিদেশে বিদেশে ঘুরি। আমার অভ্যাস এই। ভগবান সব জায়গায় সবই রেখে দিয়েছেন, একটু খুঁজে নিলেই পাওয়া যায়। কিছু অভাব নেই।'

'ক'দিন থাকবে শালবনী ? কাজ-কর্ম পেয়েছ কিছু ?'

'পেয়েছি, আজকাল থাকবো। পরশু চলে যাব!'

কিছুদূর আসিয়া একবার ফিরিয়া দেখিলাম—নির্জন মাঠে নিঃশব্দ নৈশাকাশতলে প্রসন্নমনা নির্ভরশীল বিদেশী উনানের পাশে বসিয়া। ডাল নামিয়াছে, এবার রুটি সেঁকিবে। স্টেশনের আলো তার যথেষ্ট—হোক না সে ক্ষীণ—আকাশ ভরা তারার দীপ্তি আছে মাথার উপরে। কিছুদূরে স্টেশন মাস্টারদের বাড়ির আলোও কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে, তবে সে আলোর প্রয়োজন বিদেশীর নাই।

একটু পরে শিয়াল বাহির হইবে সমস্বরে চীৎকার করিতে। স্টেশন যাত্রীরা যাতায়াত করিতেছে। ট্রেন সশব্দে আসে যায়। বিদেশী নিজের কাজে ব্যস্ত। দৈনন্দিন কর্তব্য শেষ করিয়াছে সেদিনকার মত, আর কোনদিকে তার মনোযোগ বা প্রয়োজন নাই। এতক্ষণ হয়তো বাসন দু'খানা ধুইয়া সামান্য সংসারটি গুছাইয়া তুলিয়া ছোট্ট বিছানাটা পাতিয়াছে স্টেশনের টিনের চালার নীচে এককোণে। সমস্ত রাত্রিব্যাপী নিশ্চিন্ত গভীর নিদ্রা ট্রেনের শব্দে ভাঙিবার কারণ নাই।

ঈষৎ হিম হাওয়া আসিতেছে। এ তোমার বঙ্গদেশ নহে, বৃষ্টি-বাতাসে প্রায়ই ঠাণ্ডা পড়ে এ প্রদেশে।

বন কৌতুক

শালবনী থানার ঠিক পিছনে অনেকটা জায়গা।—প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রাচীন বৃক্ষাবলী। রবি বুধবারে হাট বসে এখানে। ঘোড়া গরুর গাড়ি ও পদব্রজে ক্রেতা বিক্রেতা আসে। এত শান্ত নিরীহ হাট দেখি নাই কোথাও। যার নাম হট্টগোল। সেই গোলমাল আদৌ নাই শালবনীর হাটে। এক একদিন হাট ভাঙিতে অনেক দেরি হয়। পল্লীর হাটের মত নয়। অনেক সৌখীন জিনিসও ওঠে হাটে। গাছ তলায় ভারে ভারে শাকসবজী পান ও শিশু সন্তান লইয়া সারি সারি পসারিণী বসিয়া আছে। নিজ নিজ পণ্য বেচিয়া কাঁচের বাসন, রঙীন চুড়ি, ছিটের জামা কিনিবে। সস্তা ও টেকদার জাপানী জিনিস সরলা পল্লীবাসিনীর নির্লোভ মন ভুলাইয়া দিয়াছে। এমন স্নিগ্ধ স্বভাব ইহাদের, এক একদিন কত বেলা হয়—তবু অবিক্রীত পণ্য লইয়া অপার ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষায় বসিয়া থাকে।

শালবনী যত ছোট জায়গা হোক—আছে সব—পাওয়া যায় সব—এবং সব হাতের কাছে। হাট বাজার দোকান পোস্ট অফিস, স্কুল, পাঠশালা, ডাকবাংলো, সরকারী ডাক্তারখানা এবং স্টেশন। এমন কি চায়ের স্টল পর্যন্ত। বড়বাবুর ছেলের অসুখে অত রাত্রে তৎক্ষণাৎ দোকান হইতে আঙুর, বেদানা, বিস্কুট লইয়া আসিল।

স্টেশন হইতে মাঝিপাড়া, ক্ষুদ্র নগর; কেন্দ্র তার শালবনী পুলিস-স্টেশন। থানার বড়বাবুও খুব জনপ্রিয়। এক নম্বর, ঘুস নেন না। দুই নম্বর, অতিথি বা ভিখারী—সবার জন্যে দুয়ার খোলা। অসময়ে নিজ অন্ন পাত্রে ধরিয়া দিয়া সত্যকার গার্হস্থ্য ধর্ম পালন করেন। তিন নম্বর, বে-পরিমাণ হিন্দু আচারী। চার নম্বর—গরীবের উপর দয়া। পাঁচ নম্বর—অতি পরিশ্রমী ও ভীষণ কর্তব্যপরায়ণ। মানুষটি বেশ ভালই, লোকে সম্মান ও নির্ভর করে, ভালবাসে। কিন্তু এটা বাইরের দিক।

ভিতরের দিক,—অর্থাৎ অন্দর মহলে, লোকটি আদৌ সুবিধা নয়,—রীতিমত পুলিসি মেজাজ। বাড়িতে পদার্পণ মাত্র পাড়ার লোকে জানিতে পারে—'হ্যাঁ বড়বাবু বাড়ি এলেন।' ম্যাসে পঁচিশ দিন মফঃস্বল, বাকী পাঁচ দিনে এই কাণ্ড। সস্ত্রীক ধর্মাচরণ করেন। প্রতি পূর্ণিমায় শ্রীশ্রীসত্য নারায়ণ পূজা, বিভিন্নবার ব্রত—রবিবার ব্রত—এবং সূর্যপূজা প্রতি রবিবার। ধান কাটা লাগিয়াছে,—ঠাকুর মহাশয়ের দেরি হয় আসিতে; আঙিনায় পূজার আয়োজন সাজাইয়া বড়বাবুর স্ত্রী অপেক্ষায় থাকেন। বিশেষ পর্ব-দিনে দুই জন নির্জলা উপবাসী। বিষম কলহ—বাক্যালাপ নাই, দেখা সাক্ষাৎ নাই—ক্ষতি কি? ধর্ম পালনে ত্রুটি দেখিবে না। দোষ আছে হয়তো দু পক্ষেই। কিছু কম বা বেশি। কিন্তু বড়বাবুর পালা লোকবিদিত। অতি ক্রোধে বাসা হইতে ছিটকাইয়া বাহির হইয়া আসেন, কলহ পর্বের উপসংহার হয় থানায়। ক্রোধের পরিমাণ বাড়ে মফঃস্বল যাত্রার সময়। বিপুল এক কাণ্ড কারখানা করিয়া যান, ফিরিয়া ইনস্পেকশন রুমে অবস্থিতি। শিশু ছেলেটি একবার মায়ের কাছে একবার বাপের কাছে আসা যাওয়া করিয়া দুই কুল বজায় রাখে।

থানায় মধ্যে মধ্যে রাত্রে পাহারা থাকিতে হয় বড়বাবুকে। হাজত ঘরে নারী আসামী থাকিলে কনস্টেবলের কাছে চাবি রাখিবার নিয়ম নাই। চাবি থাকে ইনচার্জ অফিসারের কাছে। তবু বড়বাবুর বিশ্বাস হয় না।—থানার বারান্দায় খাটিয়া-পাতিয়া শীতে গ্রীষ্মে রাত্রি কাটান।

এবার বড়বাবুর বাসা আত্মীয়-জনে ভরা। পূজার আনন্দ বলে যাকে। পূজার আগে ডাকাতি কেসের তদন্ত হেতু কয়েকদিন গদাপিয়াশাল কাটাইবার সময় জ্বর হইয়াছিল। পূজার মধ্যেও জ্বর। সেই জ্বর লইয়া এদিকে আত্মীয়-স্বজনের জনে-জনের তদন্ত, ওদিকে পূজার তদন্ত! বড়বাবু—বড়বাবু—বড় বাবু। পূজা উপলক্ষে যাত্রার দল আসিয়াছে, তাহাদের থাকার ব্যবস্থা। আসর সাজানো, লোকজনের আদর অভ্যর্থনা,—সমস্ত কাজ ও দায়িত্ব-ভার

বড়বাবুর। তাহাতে আপত্তি নাই। উপবাসী মানুষটি থানায় বসিয়া আছেন। এক একবার বাসায় আসিয়া কিছু তর্জন গর্জন করিয়া গেলে কিছুক্ষণ বেশ ভাল ভাবে সময়টা চলে।

চাঁদা দিতে অনেকেই নারাজ,—কিন্তু উৎসব-আমোদের ভাগ চাই। চাঁদা চাওয়া বন্ধ হইয়া গেল। একটা সভা ডাকিয়া বড়বাবু একটা বক্তৃতা দেওয়াইলেন।

—'মহাশয়গণ! অনুগ্রহপূর্বক শুনুন। এতবড় একটা উৎসব, রীতিমত খরচের ব্যাপার। এবং ইহা সর্বসাধারণের পর্ব, একার নয় বা কোন দলভুক্ত নয়। কিন্তু কেহই দায়িত্ব লওয়া দূরে থাক—দেখা শোনা করিতেও রাজী নন। তার উপর চাঁদা দিতে চান না। আমার একার পক্ষে আগা গোড়া নিখুঁত ভাবে সম্পন্ন করা অসম্ভব। আমি দেখিব মায়ের পূজায় কোন ত্রুটি না হয়। তা ছাড়া অন্যদিকে আমি তেমন মন দিতে পারিব না! আপনাদের আগ্রহেই যাত্রাগান—অথচ আপনারাই উদাসীন।—সুতরাং যদি কোনরূপ ত্রুটি হয় বা বসিবার জায়গা সুবিধামত না পান, কিছু মনে করিবেন না। কারণ আপনারা মন না দিলে অসুবিধা ঘটা স্বাভাবিক।'

এমন অভিনব বক্তৃতা পূর্বে শুনি নাই। সৎসাহস আছে বড়বাবুর—সকলকে ডাকিয়া সত্য কথা শুনাইতে

প্রশস্ত থানা-প্রাঙ্গনে যাত্রার আসর বাঁধা হইল। বৃষ্টি নামিয়া বিপদ ঘটাইল। দুপুর বেলা হইতেই যার যার মত বাড়ির মেয়েদের জন্য, জায়গা ঘিরিয়া, বেঞ্চ বা চেয়ার আনিয়া রাখিয়া রিজার্ভ করিয়া গেল। চাঁদা যারা দিয়াছে তারাও—যারা না দিয়াছে তারাও। সেই প্রাঙ্গনটি বেড়িয়া পথ। আসিবার ও যাইবার পথে উজ্জ্বল আলোকিত দেবীমণ্ডপ ঘিরিয়া বিপুল ভিড় অতিক্রম করিবার সময় হিমালয়-নন্দিনীর অপূর্ব সুন্দর তেজোদৃপ্ত মুখখানি দেখিতে দেখিতে চলিতাম।

জ্বরে জ্বরে দুর্বল দেহ,—তবু মহাষ্টমীতে উপবাসী দুই জন।—প্রতিদিন অঞ্জলি না দিয়া জলটুকু স্পর্শ করে না।

'—কই এত দেরি কেন? করে কি সব? কাজটা কি? আসতে পারে না?'—সস্ত্রীক পুষ্পাঞ্জলি দিবেন।

সকালে বিকালে দুপুরে রাত্রে থানার সম্মুখ দিয়া যাইতে আসিতে দেখিবে অনলস ক্ষীণ দীর্ঘদেহ মানুষটি কাজ করিতেছেন নিবিষ্ট চিত্তে।

পুকুরে একলক্ষ মাছের চারা ছাড়া হইয়াছিল। সকাল বেলা প্রতিদিন জাল ফেলিয়া ধরানো হয়। আশ্চর্য লক্ষ্য বড়বাবুর—'জলের কলসীর মুখে ঢাকা নাই', কিম্বা 'রান্নাঘরের দুয়ার খোলা কেন? পান ধোয়া হয় নাই এখনো? ঘরে ঝাঁট দিতে এত দেরি? বৃষ্টি এলো, কাঠ ঘরে তোল শীগগির, আমি যেটি না দেখবো—যত সব উন্-নাজুরে এসে জুটেছে, দেখলে গা-জ্বলে যায়।'

এক একবার বাড়িতে আগমন ও তদারক।

'অ্যাঁ—এখনো পূজার জিনিস উঠানে পড়ে? কখন ঠাকুরমশাই চলে গেছে, ওঠে নি কেন এসব? বৌঝিরা পারে না? কেন হয় না তোলা? সারাদিন পড়ে থাকবে। আমি না দেখলে, না বল্‌লে—'

তারপরে ঘরে এক সময়—

'আচ্ছা, কেন অমন করে বল সবার সামনে—একটু আস্তে বললে হয় না?'

বড়বাবুর গলা ছোট হইবার নয়—'ইস্—দোষ করবে—আর আমি ওঁর কানে কানে বলতে যাবে—'

'যা বল্‌বে আড়ালে ডেকে বল না কেন? গুরুজনের সামনে—'

'রাখো—রাখো! আমি শাসন করতে জানি, আমায় উপদেশ দিতে হবে না—দশ দিনের ছুটি নিয়েছি চলে যাব যেদিকে খুসী, যা ইচ্ছে কর গে—'

হয়তো রাত্রিটা ভালোভাবে কাটিয়াছে। সকাল বেলা একপাক থানার আঙিনায় ঘুরিয়া আসিয়া—

'এখনো ঝাঁট পড়ে নি? অলক্ষ্মী না লাগবে কেন? যে বাড়ির বৌ-ঝির নেই আক্কেল—দূর—দূর—'

সম্মুখে বৌ-ঝিকে না পাইয়া—'এই হতচ্ছাড়া পাঁচু, হাজার বার বলেছি—রোদ ওঠবার আগে দিবে ঝাঁট্, দাঁড়া—'

'এজ্ঞে মার কাপড় গামছা দিতে গেছি চানের ঘরে—'

'বেরো ব্যাটা—বেরো! কাপড় গামছার কিছু বলেছি।'

চারিদিকে অবাধ জায়গা সত্ত্বেও বাসাগুলি প্রাণপণে চাপিয়া ছোট করা। একদিকে দুটি অপেক্ষাকৃত ভাল ঘর, পাশে এবং সামনে চওড়া বারান্দা, মেঝে পাকা—মাটির দেওয়াল, খড়ের চাল। অপরদিকে তেমনি লম্বা টানা বারান্দা এবং তিনটি ঘর—রন্ধন, ভাঁড়ার, একটা শয়নযোগ্যও বটে। এই দুই সারি ঘরের চালে চালে প্রায় লাগে আর কি! মাঝখানে কয়েক হাত মাত্র চওড়া এবং সুদীর্ঘ আঙিনা। আকাশ দেখিতে চাও তো সেই আঙিনায় নামিয়া ঊর্ধ্বদৃষ্টি হও।

শয়ন ঘরের বারান্দায় একটি বড় ফিতার খাটিয়া, বসিবার জন্য ভাল বিছানা করা।

পুকুর পাড়ে থানার ছোট বাবুর বাসা। মেয়েরা দিনে পুকুর পাড় দিয়া—রাত্রে সদর পথে যাতায়াত করে।

বড় বাবু অসামাজিক, নিজের কাজকর্ম—মফঃস্বল লইয়া ব্যস্ত। কিন্তু অন্দরে দিবা রাত্রি আড্ডা। একদল বাহির হইল তো আর একদল ঢুকিল। গান, গল্প, তাস খেলা, চা—সন্ধ্যা বহিয়া যায়। যখন তখন অন্দরে আসা বড়-বাবুর অভ্যাস নয়—কিন্তু স্নানাদি তো থানায় চলে না। বার বার বাধা পাইয়া মেজাজ চড়িতে থাকে! হয়তো নটার সময় ঘরে ঢুকিতে পাইলেন—কিন্তু গৃহিণীটি অদৃশ্য, যারা আসিয়াছিলেন তাঁদেরই সঙ্গে স্টেশন মাষ্টারের বাড়ি কিম্বা ডাক্তারের বাড়ি গেছেন।

এঁরা দুপুরের আগে আসেন না—এই যা রক্ষা। কিন্তু ছোটবাবুর তরুণী পল্লীবধূটি বড়বাবুনীর নিকট সামাজিক শিক্ষাদীক্ষার পাঠ লইতেছেন—বিপদ সেই খানে।

স্নানান্তে ক্ষুদ্র বস্ত্রখণ্ড পরিয়া বড়বাবু তুলসীতে জল দিতেছেন—ছোটবাবুনী খিড়কীর আড়ালে দাঁড়াইল—বড়বাবু শয়ন ঘরে ঢুকিলেন—সে বড়বাবুনীর নিকট। কিম্বা সবে আহারে বসিয়া—'অম্বল হয়নি কেন—জানতে চাই' বলিয়া কেবল উদ্যত হইয়াছেন—অথবা 'দেখ কাঁচা ঘি পাতে দিচ্ছ' বলিয়া চক্ষু পাকাইয়া চাইলেন—অমনি ছোটবাবুনীর চোখে যেমন পড়িয়া গেল,—সে অবশ্য ঢুকিল রান্না ঘরে।

গল্প! গল্প! এত গল্পও জানে উহারা।—রান্না ঘরে যেন পাঁচখানা মৌমাছির চাক ভাঙিয়াছে। এর উপর কিনা দুধ ঠাণ্ডা।

দৈবাৎ কখনো হাতে হাতে পান দিয়া কিঞ্চিৎ রসিকতা বা হাস্য—অকস্মাৎ রসভঙ্গ করিয়া ছোটবাবুনীর আবির্ভাব। রাত্রে শুইয়াও নিস্তার নাই—'মা দোর খুলুন ছোটবাবুর পরিবার বলছেন, খুব দরকার—'

এক কথায় বড়বাবুনীর পরম অনুগত মুখাপেক্ষী শিষ্য ছোটবাবুনী।

সকাল বেলা। বড়বাবুর সনির্বন্ধ অনুরোধ—'যাত্রা দেখাবেন না?'

'তোমরা তো দেখ'—

'—বই পছন্দ করে দিতে হবে! আমায় বলেছে,—আমি তো বুঝিনে কোনটা ভাল—কোনটা মন্দ'—যথার্থই ভদ্রলোক ও বিষয়ে বড় নীরস, বিপদে পড়িয়াছেন।

তিন খানা নাটকের মধ্যে দু' খানা ভাল পৌরাণিক নাটক। সেই দুটি অধিকারীকে পাঠাইয়া বলিয়া দেওয়া হইল।

ঘণ্টা খানেক পরে। বড়বাবুর অন্দরে—ছোটবাবুর মা,—মা বাহির হইতেই বধূটির প্রবেশ।

'সারাদিন থাকে এখানে কাজ করে কখন ও?'

বড়বাবুর কিশোর ভৃত্য পাঁচু উত্তর দিল—'সব কাজ চাপিয়েছে শাশুড়ীর ঘাড়ে—কিছু ফুরিয়ে গেলে আনবে না—বকুনির ভয়ে শাশুড়ী চেয়ে নিয়ে যায় এখান থেকে।'

'করে কেন শাশুড়ী ?'

'না করলে খেতে দেবে কেন ? শ্বশুরকে বলে—বুড়ো সারাদিন করে কি ? শুধু বসে থাকা—ছাগলটাকে নেড়ে বাঁধতে পারে না ?'

এমন কথা শুনিলে কে হাসি চাপিতে পারে ? পাঁচুর বেপরোয়া কথায় বড়বাবুনী কিঞ্চিত অপ্রতিভ, বিরক্ত।

ঐ যে বাগানটা বুড়োই করেছে—নিজে জল দেয়—সাফ করে—আরো কত কাজ তবু···

মায়া হয় বটে কিন্তু বিতৃষ্ণা আসে। নিজেও একদিন ছিলেন পুলিস—দোর্দণ্ড প্রতাপ। এখন নখদন্তহীন—পুত্রের অন্নদান—বধূর গঞ্জনার পাত্র। পেন্‌শন্ পায়—তীর্থে কিম্বা দেশে না গিয়া এখানে কেন ?

শালবনীতে যাত্রা—এমন সৌভাগ্য কদাচ ঘুটে কিম্বা ঘটে না। এখানকার লোক মেদিনীপুরে যায় সিনেমা ইত্যাদি দেখিতে। এমন দিনে ছোটবাবুর বাপের বিষম জ্বর। অদৃষ্ট দেখ।

'অন্যায়, খুব অন্যায়। বাড়ির ওপর যাত্রা নিশ্চয় দেখতে হবে' পুলিসি মেজাজ।

'কাল না ভোর হয়েছিল আরম্ভ হতে ?'

অপ্রতিভ বড়বাবুর হাস্য—'ঠিক ভোর নয়। সবে প্রথম দিন, কেউ আসে তো কেউ আসে না। একজন ঘুমিয়ে, রাত জেগে এসেছে। একজন বাজারে, আর একজন মেলা দেখতে গেছে তাকে পাওয়াই গেল না কাল। যাত্রাদলের কাণ্ড। আজ বলে দিয়েছি—ঠিক সাতটায় যদি আরম্ভ না হয় দরকার নেই যাত্রা তবে।'

সুতরাং আজ যে সকলে ঝাড়িয়া গান শুনিতে যাইবে সে নিশ্চিত কথা।

সকাল হইতে বড়বাবুর অন্দরে সাজ সাজ রব—ছোটবাবুনী এবং অন্যান্য সখিগণের নিকট বিনাতারের বিদ্যুৎ-বার্তা প্রেরণ সবই নিঃশব্দ সঙ্কেতে। মুখে কাহারও রব নাই।

সায়াহ্ন।—বাহিরে বিষম কোলাহল।—অন্দরে নিঃশব্দ ব্যস্ততা তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি চতুরা গৃহস্বামিনীর নিপুণ কর্তৃত্বে পাঁচু সতর্ক বানরের ন্যায় লাফাইয়া লাফাইয়া ফিরিতেছে—অসংখ্য ফরমাস্—পাশের ঘরে অবিশ্রান্ত দ্রুত অলঙ্কার-শিঞ্জন-শব্দ।

বড়বাবু আসিয়াছেন কি প্রয়োজনে—পাঁচু একঘটি জল লইয়া পাশের ঘরে যায়।

'খেয়েছিস্ তোরা?'

'সময় নেই।'

'সে কিরে? এখনো আসর পাতাই হয় নি'—

'মা বললেন দেরি হয়ে যাবে—জায়গা মিলবে না।'

'তুইও মেয়েদের জায়গায় বসবি নাকি বেটা উল্লুক, তোর এত তাগাদা কি?'

পাচু অন্তর্হিত। বাবুর কথা শোনার চেয়ে মার কাজ করা তার অভ্যাস।

'যাই—আসছি এখুনি।' বড়বাবুরও বাহিরে প্রস্থান।

অবিলম্বে ঘরে ঘরে তালা ঝুলিল—শয়ন ঘরটি বাদে। নীল হলদে সবুজ জরির মোটা চৌখুপী টানা, নূতন কান পাশা এবং প্রেম ফাঁস হারের (Love-knot necklace) ঝলকানি ও সুগন্ধিতে চারিদিকে ঢেউ তুলিয়া বড়বাবুর বাড়ির তিনটি বৌ ঝি চোখের উপর ঝিলিক হানিয়া চক্ষু ধাঁধাইয়া দিয়া ঝলমল করিতে করিতে রঙের তরঙ্গ তুলিয়া নীরব শশকের ন্যায় অতি ক্ষিপ্র দ্রুতবেগে বাহির হইয়া গেল, যেন এক নিমিষ দেরি হইলে রাজত্ব হারাইবে। এক নিমিষ। যেন একটা নির্বাক চলচ্চিত্রের অভিনয় হইয়া গেল। লোকজন নাই—ব্যস্ততা

নাই—একটা আলো মৃদুভাবে জ্বলিতেছে এক কোণে, কিন্তু শূন্য রঙ্গমঞ্চ, অভিনেতাগণ অন্তর্ধ্যান করিয়াছে। এই সব কি সুন্দর যাত্রা নয়?—অভিনয় নয়? সত্যকার কোন অভিনয় ইহার চেয়ে বড়? আমি যা দেখিতেছি—সে তুমি নও, তুমিও আমাকে যা দেখিতেছ ইহা ছদ্মবেশ মাত্র। তবে ঘটা করিয়া রঙ্গমঞ্চের অভিনয় দেখিয়া লাভ কি? যেখানে জনহীন ছায়াচ্ছন্ন পথ অপেক্ষা করিয়া আছে?

চাঁদ আরও পশ্চিমে হেলিল। নির্জন সীমাবদ্ধ সঙ্কীর্ণ গৃহাঙ্গনের জ্যোৎস্না বাঁকা হইয়া বারান্দার দেওয়ালে উঠিয়া পড়িল। রাত্রি প্রথম প্রহর তো অনেকক্ষণ শেষ হইয়া গিয়াছে। যাত্রা আরম্ভ হইয়াছে কিনা কে জানে, অন্ততঃ প্রথমে তো একখানা কোরাস গান হইবেই। সুতরাং স্পষ্ট জানা যায় আরম্ভ হয় নাই। তাতে কি? দর্শক একটিও বাকী নাই জুটিতে। ঐ যে পুকুরের উঁচু পাড়ের পরে গৃহস্থ-পল্লী উহারা কেউ নাই ঘরে। পুকুরের এ পাড়ে বড়-বাবুর ঘর—ওপারে জঙ্গল—ডানদিকে ছোটবাবুর বাসা—বাঁদিকে ঐ গৃহস্থ পল্লী শালবনীর স্থায়ী বাসিন্দা ওরা—ছোট ছোট খড়ের দোচালা চৌচালা ঘর,—লম্বা একটা ঢেঁকিঘর পুকুর পাড়ে। সেই ঢেঁকিঘরটি যেন বৈঠকখানা মেয়েদের। মাটির উঁচু মেঝে নিপুণ নিকানো। গাছপালার ছায়ায় জলের হাওয়ায় সর্বদা স্নিগ্ধ। সেইখানে সারাদিন কাজকর্ম,—ঢেঁকিতে শস্য কোটা, যাঁতায় ভাঙা, কুলায় ঝাড়া, সে সব সারা হইলে ঝাঁট দিয়া পরিষ্কার করিল। দু' তিন জনে তেল মাখিতে বসিয়াছে,—লম্বা লম্বা চুল এলাইয়া। স্নানান্তে ঐ বেড়ার গায় কাপড় শুকাইতে দেয়। দুপুরে কাঁথা সেলাই করে—সুপারী কাটে কিম্বা আর কোন কাজ নতুবা ঘুমায়। পড়শীরা আসিলে কথাবার্তা বলে। রাত্রেও প্রদীপ জ্বালিয়া কাজ করে ঢেঁকিঘরেই।

কিন্তু আজ ঢেঁকিঘর অন্ধকার। গৃহিণী বা বধূ, জানি না—মেয়েটিকে দেখিতে শান্ত—শ্যাম দীর্ঘাঙ্গী, বড় বড় চোখে অসঙ্কোচে মুখের দিকে চায়। খাস বাঙালার পল্লীবধূর মত লজ্জায় চোখের পাতা ভাঙিয়া পড়ে না। বড়-

বাবুনীদের মত জমকাল সাজ সজ্জা করিয়া সভা জমকাইয়া বসিবার সাধ্য অবশ্য উহার নাই। কিন্তু আজ রূপার ডায়মনকাটা চুড়ি ছয়টি—কপিপাতা মাকড়ি দুটি এবং লাল বেলাপাড় চন্দ্রকোণার শাড়ীটি সযত্নে বাক্স খুলিয়া বাহির করিয়াছে। এবং মাটিতে পাতা বিছানায় এককোণেই বসিয়াছে অবশ্য। কিন্তু সমস্ত রাত্রি জাগিয়াও বিছানায় আর আজ শুইবে না। যাত্রা দেখিয়া ফিরিয়া গৃহকাজে মন দিবে। তারপরে কর্মাবসরে দুপুরে ঢেঁকিঘরেই মাদুরটি বিছাইয়া এক ঘুম ঘুমাইয়া কাজ সারিয়া রাত্রের জন্য প্রস্তুত হইবে। বড় বাবুর অন্তঃপুরিকাদের মত যাত্রা দেখিয়া আসিয়া বিছানায় পড়া—দশ এগারটার সময় উঠিয়া চা স্নানাদি—দুপুরে আবার বিছানা,—সন্ধ্যায় উঠিয়া সাজসজ্জা করিয়া আবার প্রস্তুত হওয়া, এ উহারা জানে না। মানায়ও না। বিধাতা যাকে যা গড়িয়াছেন।

তুমি যদি যাত্রা না দেখিবে—তোমারও একটা কর্তব্য আছে। বাড়ি সুদ্ধ সব চলিল, নচেৎ জায়গা পাইবে না। বড়বাবুও বাহিরে গিয়াছেন—সবে আসর বসিতেছে—সময়টা একটু গোলমালের সময়। এদিকে শূন্য বাড়ি পাহারা দিবে কে? দেওয়াল নীচু—নির্জন পুকুরপাড় দিয়া খিড়কী দুয়ারে পা রাখিয়া একটি ছোটখাট মাত্র লাফ দিয়া অনায়াসে ভিতরে আসা যায়। থানার চৌকিদার কনষ্টেবল আজ বিষম ব্যস্ত—বার বার বাসা দেখিবে—এমন অবসর কাহারো নাই আজ। সুতরাং কি করিতে তুমি?

কিন্তু সুন্দর কৌতুকজনক অবস্থা, মজা দেখ একবার।—বন্দী স্বেচ্ছায়ও নয়—বাধ্য হইয়াও নয়—অকারণ বন্দী,—ঠিক অকারণ নয়—ঘটনাচক্রে বন্দী।

কই সেই নির্জন বন্য পথ? জ্যোৎস্নাধৌত পথটি? কই আকাশ? লম্বা হইয়া জ্যোৎস্না পড়িয়াছে উঠানের মাঝখানে। আচ্ছা, কনট্রাক্টর এইটুকু উঠান রাখিয়াছে কেন? দুই দিকের চাল একত্র লাগাইয়া দিলেই সুবুদ্ধির কাজ হইত। আমরা পরাধীন জাতি, কথায় কথায় বিদেশী গভর্নমেণ্টকে দোষ দেই—কিন্তু দেশীয়দের হাতেই কি আমাদের চরম দুর্গতি নয়? এই সব বাসা-

বাড়ির জন্য যে পরিমাণ টাকা মঞ্জুর হয়—তাহাতে উৎকৃষ্ট বাংলা প্যাটার্নের বৃহৎ বাসা তৈরি হইতে পারে। কনট্রাকটর দেশী, বিলাতী নয়। ঠিক টাকাটা খরচ হইল এবং যত রাজ্যের সস্তা বাজে পুরানো জিনিস আনিয়া ঘর দুয়ার তৈরি—তার চাক্ষুষ প্রমাণ সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত বোধ হয় একটি অফিসারও অভিযোগ করেন নাই।—তাঁরা মনে করেন—আমি ক'দিন? বদলী হয়ে গেলেই গেল,—দরকার কি হাঙ্গামার মধ্যে গিয়ে? সমস্ত ঝঞ্ঝাট এড়াইয়া কোন মতে জীবিকা নির্বাহ করিতে পারিলেই বাঙালী আমরা পরম খুশী। কিন্তু এটা ভুলিয়া যাই—যে বদলী হইয়া গিয়াও, এইরূপ একটি বাসাতেই উঠিতে হইবে। এই শান্তিপ্রিয় স্বভাবই আমাদের সমস্ত অনিষ্টের মূল। এতটুকু সৎ সাহসের অভাব যেখানে—সেখানে গৃহ কেন—বিবরে বাস করিতে দিলে তাই স্বীকার করিয়া লইব—তবু কথাটি বলিব না। আবার কোন মতে গোঁজামিল দেওয়া এই বাসাবাড়িগুলি বছর বছর মেরামতের দরকার হয়। তখনও ঐ ব্যবস্থা। নির্দিষ্ট টাকার অর্ধেকও ব্যয় হয় না।

এ তো গেল কনট্রাকটরের কথা। কিন্তু বাসায় যাঁরা বাস করেন? বদলীর সময় শাক সবজী (নিজের বোনা) যতটা পারেন উৎপাটন করিয়া আঁটি বাঁধিয়া লন। ফল ফুলের কুঁড়িগুলি পর্যন্ত বাদ দেন না। অনেকেই যে কাজটি করেন—সেটা অনেকেই জানেন—সমস্ত ফলবান লতা ও গাছের মূল কাটিয়া রাখা।—এই তো আমাদের স্বভাব। আমি গেলে তুমি আসিবে—আমারই দেশী ভাই—তাও প্রাণে সয় না। তবু স্বায়ত্ত শাসনের জন্য লাঠালাঠি বাধাই। লাঠালাঠি অবশ্য নয়—সে আর কয় জন করে?—গলাবাজি করি, চীৎকার করিয়া ঘোষণা করি—সভা ডাকি। হাঁ ঐ একটা জিনিস আমরা খুব পারি, বড় বড় সভা এবং উচ্চকণ্ঠে জোরালো ভাষায় বক্তৃতা—ঐ গুণ আছে ষোল আনা। তার পর একদিন স্বায়ত্ত শাসন পাইবই—এবং পাইয়া যদুকুল বা পাণ্ডব বংশের মত নিজেদের মাথায় নিজেরাই বেশ ভাল রকম লাঠি মারিতে পারিব। সুখ দুঃখ যার যার নিজের হাতে—নিজেদের ভাগ্য নিজেরাই

গড়িয়া লইয়াছি। এখন বৃথা পরকে দোষী করিলে চলিবে কেন? মোগল শাসন হইতে আরম্ভ করিয়া কি ভাবে আমরা আত্মবিক্রয় করিয়াছি—কন্যা, বধূ, ভগিনীর মর্যাদা রাখি নাই—আজও রাখি না—যার ফলে তাহারা নূতন পথ আবিষ্কার করিয়া লইয়াছে—সে পথ কুপথ কি সুপথ জানিনা—জানিলেও বলিবার উপায় নাই।

এইসব কথা এত শীঘ্রই কি ভুলিবার? আমার দেশ? আমার দেশ আজ যদি ফিরিয়া পাই রাখিতে পারিব কি? চারিদিকে শতচক্ষু চাহিয়া আছে, আছে কাড়িয়া লইবার লোভে! দেশরক্ষা করিবার শক্তি আছে—একথা বলিতে পারি কি? কই সে শক্তি? বাহুবল? সাহস? বাঙালীর ইতিহাস সৃষ্টি হইবার পর হইতে যুগে যুগে আমরা দাসত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছি। আজ না হয় ইংরেজের দোষ দিব কিন্তু ইংরেজ শাসনের পূর্বে আমাদের দশা কি ছিল মনে পড়ে কি? তখন তো দেহে বল ছিল—মনে ছিল সাহস, কিন্তু ঠগী দস্যুর হাতে—বর্গীর শাসনে—যখন রাজার প্রভুত্বে যে অপরিমেয় দুর্গতি সহিয়াছি—কতটুকু তাহার প্রতিকার করিতে পারিয়াছিলাম? হিন্দুর দেশে হিন্দুর তীর্থযাত্রার পথ কি বিপদসঙ্কুল ছিল। সত্য কথা যদি অপ্রিয় হয় হোক,—সত্য চিরদিনই অপ্রিয়,—কিন্তু একথা আজ অকুতোভয়েই বলিব যে হিমালয় হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত অবাধ স্বাধীন ভ্রমণে আজ আমাদের বাধা দিতে পথের পাশে পাশে দুর্ধর্ষ দস্যুদল প্রচ্ছন্ন ভাবে অপেক্ষা করিয়া থাকিবে না।

যাত্রা আরম্ভ হইয়া গেল,—ঐ বুঝি গানের সুর।—কোলাহল কমিয়া গিয়াছে।

কিন্তু দেশ ভ্রমণে বাধা নাই, সেইটিই সবচেয়ে বড় কথা? নিজের দেশকে ভালবাসিয়া বিদেশী আইনে ভারতবাসী দণ্ডিত। আজও চা বাগানের কুলী-কাহিনী মর্ম্মন্তুদ ব্যাথায় জ্বলজ্বল করিতেছে,—এই তো সেদিনের নীলকর বিষধরের অমানুষিক অত্যাচারের অগ্নিলেখা আজও মিলায় নাই। পদে পদে

বাধা, যন্ত্রণা। তাই তো বলিতেছিলাম ষোল আনা ছিল আমাদের কবে? স্মরণাতীত কাল হইতে বাঙালীর ইতিহাস ছিল কি কখনো? প্রতাপাদিত্য? সীতারাম রায়? খুঁজিলে আরও দুই একটি মিলে—কিন্তু তাহা লইয়া আর যা কর—বড়াই করিও না।

"আমরা ত্যাগী—আমরা ত্যাগী—ভারতবর্ষ ত্যাগের দেশ"—

এখন কথাটি বদলাইয়া বল—লোভের দেশ। মহত্ত্ব, বীরত্ব যা কিছু ছিল সে আমাদের নয়। কোন্ এক মহাজাতির অংশ ভ্রষ্ট হইয়া বাঙালী গড়িয়া উঠিয়াছে—সেইটি অনুসন্ধান করিলে অনেক কাজ হইবে।

কিন্তু হায়—এই সব কি আমার কথা? এই সব বড় বড় তথ্যপূর্ণ কথা ভাবিবার জন্য দেশে জ্ঞানবান বিদ্বান পণ্ডিতের অভাব নাই, এ সব তো তাদের কাজ। আমার কেন এ বিড়ম্বনা? এ শুধু অকারণ বন্দীর অসম্বদ্ধ চিন্তা।

বিশ্বাস কর—বিশ্বাস কর—এ কথা আমার নয়—আমার নয়—আমার কথা তো জান?

Wealth I seek not, hope nor love,
All I seek the heaven above
And the road below me.

তা ছাড়া আর কি প্রয়োজন?

Give to me the life I love.

বড় বাবুর প্রবেশ।

এইবার ছুটি মিলিল বন্দীর। বন্দীর না রক্ষীর?

শয়ন গৃহের দ্বারে প্রকাণ্ড তালা পড়িল। সদর দুয়ার পার হইয়াই থানার আঙিনা। জ্যোৎস্না মিশিয়া গিয়াছে তীব্র আলোকমালায়। দিনের সুস্পষ্টতা সর্বত্র। বাঁদিকে সিপাহী চৌকিদার মিলিয়া একটি বাগান করিয়াছে—সেইখানে গাছপালার আড়ালেও পড়িয়াছে আলো। অপর পার্শ্বে বৃহৎ ইন্দারা, তার পরে ছোট বাবুর বাসা। সুবৃহৎ বটবৃক্ষতলটি কিছু ছায়াময়।

সম্মুখে উজ্জ্বল আলোকতলে সুবৃহৎ আসর। লোকে লোকারণ্য, ভিতরে জায়গা না পাইয়া বহু দর্শক সারিদিয়া আসর ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে।—যাই কোন পথে?

আছে,—আছে পথ—আছে। থানার পিছনে বিস্তৃত হাটখোলা এখন শূন্য, সেই ছায়াচ্ছন্ন নির্জন প্রশস্ত নিভৃত পথে,—কে বলে পথ নাই? পথ আছে সর্বত্র, চিনিতে না পারিয়া বিড়ম্বনা সহ্য করি।—সম্মুখে সূচীভেদ্য স্থান নাই বটে—কিন্তু পশ্চাতে অবারিত উন্মুক্ত স্থান অপেক্ষা করিয়া শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে।

শূন্য?—শতাধিক গরুর গাড়ি সারি সারি লাগানো। আরোহীগণ যাত্রার আসরে—সুতরাং স্থানটি নিঃশব্দ নির্জন বটে।—শূন্য গাড়িগুলি নামানো। বলদগুলি গাছের তলায় তলায় বাঁধা। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছের নীচে সমগ্র হাট-খোলাটি ছায়াময় আঁধার—আঁধার। স্থানে স্থানে উনান কাটা হইয়াছে, অঙ্গার মধ্যে তখনও অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ দেখা গেল।

কিন্তু এক মুহূর্ত দাঁড়াও,—একটি মুহূর্ত। সম্মুখে এই বৃহৎ শামিয়ানার নীচে বিস্তীর্ণ আসর, ইহারি একটা দিক তো বড়বাবুনী প্রমুখ বরবর্ণিনীগণের জন্য নির্দিষ্ট? নির্দিষ্ট কি?—রিজার্ভ—রেজেষ্ট্রী করা, দলে দলে তোমরা দাঁড়াইয়া পা ভাঙিয়া গেলেও ঐ দিকটার একটি আসন স্থানচ্যুত হইবে না।—কিন্তু এই জনারণ্যের মধ্যে কোথায় সে রূপঝলমল স্থানটি? যেখানে সমস্ত আসরের দৃষ্টি? অভিনেতারাও নিজেদের চেয়ে উত্তম অভিনয় দেখিয়া লইতেছে ফাঁকে ফাঁকে,—কোন্ দিকে উজ্জ্বল করিয়া বসিয়াছে সে মারাত্মক কটাক্ষকারিণী দল?—সে করতলে রঙীন রুমাল, মণিবন্ধে রিষ্টওয়াচ, চোখে চশমা—পায়ে জরির আঁজি দেওয়া উঁচু গোড়ালির বিনামা? কোথায় সে অদ্ভুত বেশভূষাসজ্জিত কিম্ভূত কিমাকার কলিকালের বিদ্যাধরীর পাল?

* * *

গরুর গাড়ির ফাঁকে ফাঁকে—গরুর পাশে পাশে—আলো-ঝিলমিল

দেবী মণ্ডপের পিছনে জ্যোৎস্না আঁকা ঘন ছায়াচ্ছন্ন গাছতলায় পথ। কাপড়ের দোকান তখনো খোলা। সমস্ত রাতই খোলা থাকিবে।

যাত্রা আরম্ভ হইয়াছে অনেকক্ষণ। নাচ গান অসিঝনৎকার আস্ফালন চলিতেছে সতেজে। আশে পাশের পল্লীগৃহস্থেরা—যারা ভিড়ে জায়গা পায় নাই—নিজ নিজ ঘরে শুইয়া আছে। এবং কানে শুনিয়া চোখে দেখার ক্ষোভ মিট ইতে:ছ বোধ হয়।

দেবীমণ্ডপ এবং থানাপ্রাঙ্গনের সম্মুখের সমস্ত স্থানটি জুড়িয়া বিষম ভিড়—আসরের চতুর্গুণ দর্শক—তিল ধারণের স্থান নাই। সম্মুখে এক চমকপ্রদ দৃশ্য। পশ্চাৎ দিকের এক প্রকাণ্ড গাছে উঠিয়া তরুণ বয়সী এক কৃষ্ণাঙ্গী! গাছটি তার নিরাপদ দুর্গ। ভিড়ের ভিতর জায়গা পায় নাই—কিন্তু সর্বোচ্চ ও সর্বোৎকৃষ্ট স্থান বাছিয়া লইয়াছে। জ্যোৎস্নায় উৎসব-মণ্ডপের উজ্জ্বল আলোকে, গাছের প্রায় মাঝামাঝি দাঁড়াইয়া এক পা সম্মুখের ডালে, পিছনে মোটা মোটা ডালে একটু হেলিয়া সুন্দর ভঙ্গীতে নিবিষ্ট মনে যাত্রা দেখিতেছিল।

দেবীমণ্ডপের পিছনে হাটখোলার পরে কতকগুলি ঘর। তার একটা বুঝি সাজঘর হইয়াছে। সেনাপতি আসিয়া পোষাক ছাড়িতেছে, আর একজন পরিতেছিল জরি পাড় হল্‌দে ধুতি ও বেগুনি রঙের জরির কল্‌কা দেওয়া আঙ্গরাখা। অভিনেতাগণ খুব দীর্ঘ ও বলিষ্ঠকায়, যাত্রা ভাল হইবারই সম্ভাবনা। মাথায় সকলের কোঁকড়া বড় বড় চুল—সাজসজ্জা থিয়েটারী ধরণ। যাত্রা আর যাত্রা নাই। সেকাল মিশিয়াছে একালে।

"বড়বাবু—শা-বাড়ির মেয়েরা বসবার জায়গা পান নি—দাঁড়িয়ে আছেন। "বড়বাবু—বড় আলোটা নিভে যাচ্ছে।"

"মেদিনীপুর থেকে অতিথি এলো।"

"বড়বাবু—রায় বাড়ির ওঁরা ভিড়ের মধ্যে পথ পাচ্ছেন না আস্‌তে"—

"বড় বাবু—ঠাকুর মশাই কি বলবেন—"

"কানাই আজ সমস্ত দিন খায়নি"—

"এখনো লোক আস্‌ছে—কিন্তু জায়গা তো একটুও নেই—"

রহিল সমস্ত রাত—শতেক অভিযোগ—নিরলস বড়বাবু।

রহিল যাত্রার আসর এবং সংখ্যাতীত দর্শক—দর্শনার্থী।

পরদিন। পূর্বাহ্ন।

—"রাত্রে তোমরা ফিরেছিলে কখন ?"

"চারটে হবে।"

"সমস্ত রাত ?—খুব ভাল হয়েছিল বুঝি ?"

"দেখলেন না! আজ দেখবেন।"

বড়বাবুনীর দেবর ছিলেন উপস্থিত। জবাব দিবার পালা তাঁর।

ওঁরা দেখেছেন না কি কিছু ? ভাল না মন্দ ? একটা দিক জুড়ে তো ওঁদের একটা দল। গপ্প! গপ্প! পর্দা তো ছিল না? নিজেরাই করলেন যাত্রা—আর সবাই দেখলে।"

"যাত্রা মানে ? গান গেয়েছিল না কি ?"

"তার বেশি! যার যত ভাল শাড়ী ভাল গহনা ছিল সব পরা। শাড়ীর নাম জানেন ? লাইট হাউস শাড়ী—আলোতে জ্বলছিল যেন লাল সবুজ হলদে সব আলো। লোকে যাত্রা দেখা ছেড়ে ওঁদের হাতনাড়া মুখের ভঙ্গী হাসাহাসি এই সবই দেখেছে,—

"দেখবার জিনিস বটে"—

"হ্যাঁ—সে কথা ঠিক। বাচ্চাটা অবধি সমস্ত রাত জেগে জ্বর হোক এবার"—

"বাচ্চার বাপ ?"

"দাদা ওসব দেখে না। তিনি বাড়ি পাহারা, সারারাত বারান্দার খাটিয়ায়"—

"বাহবা!—বাহবা!—আজও তাই হবে ?"

"নিশ্চয় !—যতদিন যাত্রা আছে—ততদিন।"

যথার্থ—অতি ন্যায্য কথা। লাইট হাউস শাড়ীর লাইট, প্রেমফাঁস হারের জলুষ, জরির আঁজি দেওয়া বেগুনি ভেলভেটের ফিতায় উঁচু-খুর জুতার গৌরব অন্দরে বদ্ধ থাকিবার জন্য কদাচ সৃষ্টি হয় নাই।

পাঁচু বলিল—"আর ছোট বাবুর বাপ—"

"কি হয়েছে? জ্বর কমেছে তো তাঁর? ভাল আছেন?"

"নাঃ—তেমনি জ্বর। ওঁরা তো যাত্রা দেখেছেন সবাই মজা করে"—

"ঐ অসুখ বাড়িতে একা ফেলে?"

বড়বাবুনী জবাব দিলেন "না না তা কেন? সেপাই ব্যারাকের বারান্দায় ওঁকে রেখে"—

"কাছে কেউ ছিল না?"

একঘটি জল একটা গেলাস রেখে দিয়েছিল। থানার গায়েই তো? সেপাইরা আসছে যাচ্ছে দেখছে।"

"মাটিতে?"

"না খাটিয়া আছে বারান্দায়।"

হেন কালে ছোটবাবুর বাসা হইতে একথালা দোকানের মিষ্টান্ন আসিয়া উপস্থিত।

"ওদের বাড়ির জিনিস ছোঁয়াও অন্যায়।" বড়বাবুনীর দেবর সোৎসাহে বলিল—"আমার ন্যায়-জ্ঞানটা কিছু কম—অতএব"—

শুক্ল পক্ষ—দেবী পক্ষ। চন্দ্রালোকে ধৌত নির্মেঘ নীল আকাশ। গোলমাল ধুমধাম দূরে। সম্মুখে এক বিরাট বটবৃক্ষ—শতাধিক পক্ষীর নিবাস। দিনের আলো ভাবিয়া কাক মাঝে মাঝে কলরব করিয়া উঠিতেছে। যাত্রা গান ও বক্তৃতা শোনা যায় এখান হইতে। তখনো সম্মুখের পথে দর্শকেরা যাওয়া আসা করিতেছিল। চারিদিকে প্রাচীন বৃক্ষশ্রেণী। বিশালকায় অশ্বত্থ শিশু—বট ও শাল। পরস্পরের শাখাপ্রশাখা ঘন জড়ানো। কোন্‌টি কোন গাছের চিনিতে

পারা দায়। সেই নিবিড় পত্র শাখের ফাঁকে ফাঁকে জ্যোৎস্নারেখা নামিয়া প্রাচীন কালের গোলক ধাঁধাঁর মত রূপার আলপনা কাটিয়াছে পথের উপরে। বাতাসে হিমের স্পর্শ।

শেষ রাত্রে ঘুমের মধ্যেও শোনা যায় গানের করুণ ও উচ্চ সুর! পূর্ব দিকে থানা প্রাঙ্গনের উৎসব-আলোক রেখা। উত্তর দিকে ভয়ানক নির্জন। ঘন গাছপালায় ছায়ান্ধকার নিবিড়। পশ্চিম দিকে খোলা মাঠ—মাঠে বড় বড় গাছ। ওপাশে ডাক্তারখানা, ডাক্তারের বাড়ি। সম্মুখের দক্ষিণ দিকে আলোছায়াময় পথে লোক চলাচল। সমস্ত দিন সমস্ত রাত্রি কত দূর দূরান্তর হইতে পূজামণ্ডপ উদ্দেশে দর্শনার্থীদের আগমন। সারা বছরের আনন্দ।

হাটখোলার গরুর গাড়ি সারি সারি। লোকে সপরিবারে আসিয়াছে যাত্রা দেখিতে। রঙিন কাপড়-পরা বৌঝি এক একবার গাড়ির কাছে যাইতেছে। গাড়িতে আছে জিনিসপত্র ও ঘুমন্ত ছেলেমেয়ে। দুই দিনের জন্য অস্থায়ী বাস উহাদের। বাজারে চাল ডাল কিনিয়া গাছ তলায় রাঁধিবে। স্নান করিবে পুকুরে। চিরাভ্যস্ত সংসারের একটানা খাটুনি হইতে ক্ষণিকের জন্য আনন্দময় নিষ্কৃতি। শিরিষ গাছের কম্পিত ঘন পত্রজালের মধ্য দিয়া কি ঠাণ্ডা আসে। আকাশে তারা দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিতেছে। প্রভাতের দেরি নাই। কার কোলের ছেলেটি কাঁদিয়া উঠিল।

শালবনীর পথে

বড়বাবুর বাচ্চাটি ট্রাইসিকেলে ছুটিয়াছে। একটি বছর-সাতেকের মেয়ে দৌড়াইতেছে সাইকেলের পিছনে। কিছুদূর আগে কালো লতাপেড়ে কাপড়-পরা একটি মেয়ে যাইতেছিল। ছোট মেয়েটির মাথায় কাপড়—সিঁথেয় সিঁদুর।

"এই খুকী—তোর বিয়ে হয়েছে?"

মেয়েটি মাথা হেলাইল।

"সন্ধ্যাবেলা একলা পথে কেন তুই ?"

"বাড়ি কোথা তোর ?"

বড় মেয়েটি ফিরিল।—জবাব দিল—"এই তো কাছে।"

"এ তোমার কে ?"

"মেয়ে।"

"তুমি জেলে যাওনি কেন ?"

"কেন—জেলে যাব কেন ?"

"এত ছোট মেয়ের বিয়ে দেয় ? তোমায় এখুনি জেলে দিতে পারি। তুমি, তোমার স্বামী, তোমার বেয়াই বেয়ান ঠাকুর মশাইসুদ্ধ—থানায় একবার শুধু বলা"—মেয়েটি হাসিতে লাগিল। বলিল—"দাও না ?"

ক্রমে ঘোর সন্ধ্যা হইল। তবু তাদের বাড়ির দেখা নাই।

"এদিকে এসেছিলে কেন ?"

"বাজার করতে"—

একখানা ভারি লরী গেল,—বাস গেল একটা,—দুখানা মোটর, সবই মেদিনীপুরের দিকে। বড় পুলটা পার হইয়া অনেক পরে তাদের বাড়ি। সন্ধ্যার পরে এই দিকটা বড় ভীতিজনক। অত্যন্ত উঁচু বাঁধানো পথ। দুই দিকের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছপালায় ঘন অন্ধকার। পথের দুই পাশে অতি নীচু জমি। শস্যের ক্ষেত। তারই মাঝে মাঝে পল্লী-গৃহস্থের ঘর। চারি দিক যেমন নির্জন তেমনি অন্ধকার। কদাচিৎ দুই একটা ঘর হইতে ক্ষীণ আলো দেখা যায়। পথ হইতে ডানদিকে নামিয়া তাদের বাড়ি। পথ হইতে বাড়িটি ছোট দেখায়, কিন্তু ছোট নয়। মাটিলেপা মস্ত ধপধপে আঙিনা, সম্মুখে একটা ঘর। তার পরে বড় মেটে দোতলা। একখানা সতরঞ্জি বাহির করিয়া বসিতে দিল। কত যত্ন—আদর। উঠানে তুলাস মনসা-তলা ঘেরা ফুলের গাছ, প্রদীপ জ্বলিতেছে।

মেয়েটির স্বামী গরু বাছুর লইয়া ফিরিল। বাড়িতে প্রাচীর নাই।

চারিদিকে লোক নাই—জন নাই—দরকার কি প্রাচীরের ? অনেকখানি জায়গা কঞ্চি ঘিরিয়া শাকসব্জীর ক্ষেত। বারান্দায় মাদুর পাতিয়া বসিয়া তিনটি বৃদ্ধা। স্নেহ মাখানো স্বরে জিজ্ঞাসাবাদ করিল।— মেয়েটি বলিল— 'আমার মা—ঠাকুমা—পিসিমা।"

স্বামীটি ঘর জামাই। এটি মেয়েটির পিতৃ সম্পত্তি।—একটি মাত্র মেয়ে, বিয়ে দিয়াছে শখ মিটাইতে এত ছোট বয়সে। সুন্দর গৃহস্থালীটি। হাস্যমুখী মিষ্টস্বভাবা গৃহিণী। মা ঠাকুমাদের যত্নে রাখিয়াছে। স্বামীটির স্ত্রীর উপর নির্ভর। হাট বাজার করে স্ত্রী। বৃহৎ দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যে থাকিয়াও জীবন আনন্দময়। আপনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছে।

সে কত দূর—কতদূর থানা হইতে। ফিরিবার পথে মেয়েটি পথ পর্যন্ত সঙ্গে আসিল। বড়বাবুর সাড়ে চার বছরের নির্ভীক বাচ্চাটি সেই অন্ধকার নির্জন সুদীর্ঘ পথে ট্রাইসিকেল ছুটাইয়া দিয়াছে সকলের আগে। দেখিতে দেখিতে সাদা পাঞ্জাবীর ছোট্ট পিঠটা একটি বিন্দুর মত ছোট হইয়া আঁধারে অদৃশ্য হইয়া গেল।

অনেকক্ষণ পরে দেখা গেল দোকানের আলো। এক পরিত্যক্ত জনহীন অন্ধকার দ্বীপ হইতে লোকালয়ে প্রবেশ। দোকানের সম্মুখে বাচ্চাটি সাইকেলে বেড়াইতেছে। পথে বাস মোটর গো পালক ও গরুর গাড়ি। তারই মধ্যে একফোঁটা আরোহীটি পৌঁছিয়াছে তবে।

শিক্ষার আলো প্রবেশ করিয়াছে শালবনীর অজ্ঞাত জঙ্গলে। সেই ধান ক্ষেতের মধ্যে কুটীরে কুটীরে দেখিবে বারান্দায় আলো জ্বালিয়া মাদুরে বসিয়া ছেলে মেয়েরা মুখস্থ করিতেছে—পাষাণ বাসনা নিরাশ—নিবিড়।

কোজাগরী পূর্ণিমা। পৃথিবী জ্যোৎস্না বন্যায় ভাসিতেছে। বৃক্ষচ্ছায়া গভীর— জ্যোৎস্না উজ্জ্বল। উদার আকাশ, প্রশান্ত পৃথিবী। তৃণদলে অরণ্যে

অস্পষ্ট অন্ধকার।—চতুর্দিক শান্ত। উচ্ছ্বাস, আবেগ, কোলাহল কোথাও কিছু নাই। কদাচিৎ শুনিবে শঙ্খধ্বনি।

ঘরে ঘরে বিশ্বমাতা লক্ষ্মীর বন্দনা। গভীর বনের মধ্যে পর্ণ কুটীরেও শঙ্খ বাজিতেছে। তুমি শত উপহার সাজাও—কিন্তু দীন গৃহাঙ্গনে মায়ের চরণচিহ্ন কি পড়িবে না? স্নেহকরুণ দৃষ্টি—স্বর্ণপদ্ম হাত, মধুর জ্যোৎস্নাদীপ্ত হাস্য—ও হাসি তো মায়েরই, নচেৎ কোজাগরী রাত্রির স্বর্ণাভ শুভ্র জ্যোৎস্নার মত আর কোন পূর্ণিমার আলো?—

গাছে গাছে দেছ ভারে ভারে ফল—মাঠে মাঠে দেছ ধান'—তার জন্য তো প্রাসাদের আবশ্যক নাই। যে বলে লক্ষ্মী দুই হাতে স্বর্ণবৃষ্টি করেন তারই উপর—যে মায়ের কৃপা লাভ করে। কিন্তু তার কথা তো সত্য নয়। কাঞ্চনময়ী কমলার দৃষ্টি যেখানে পড়ে তাই কাঞ্চন হয়। তার মানে কলসী কলসী মোহর নয়। প্রাচীন বননিবাসী ঋষিকুটীরে তবে কি মায়ের অকৃপা ছিল? যে ক্ষুদ্র পর্ণগৃহনিবাসী মহাতপা বশিষ্ঠের সম্পদ দেখিয়া রাজচক্রবর্তী বিশ্বামিত্র ঈর্ষায় জ্বলিয়াছিলেন, রাজমুকুট তুচ্ছ হইয়া গেল বল্কলবাসের নিকট।

'গোষ্ঠে গোষ্ঠে সুশীলা কপিলা দুধের নদীতে তুলেছ বান'—।

এই সম্পদ ছিল বশিষ্ঠের—মণিরত্ন হীরক কাঞ্চন ছিল না বিশ্বামিত্রের ন্যায়। দুধের নদীতে যে বান তুলিতে পারে সেই এক মাত্র সুশীলা কপিলা মায়ের আশীর্বাদরূপে বশিষ্ঠের ছিল। —আপন লুব্ধ অন্তরের লোভে অন্যরূপ বুঝিও না।

জ্যোৎস্না কি শুভ্র? ঈষৎ যেন স্বর্ণাভা মিশানো আছে, স্নেহময়ী মায়ের আশ্বাসদায়িনী মধুর কল্যাণময় হাস্য। আজ জ্যোৎস্নায় বান ডাকে নাই। স্নিগ্ধ সন্ধ্যাকাশ তলে অপেক্ষাকারীর দল। বিচ্ছেদ ব্যথায় ঈষৎ পীড়িত মন। আশার পরে নিরাশা—মিলনের পর বিচ্ছেদ। যখনি তোমার সাধ পূর্ণ হইল —চিত্তক্লেশের বেদনা লুকানো আছে সে পূর্ণতার মধ্যে, অচিরে আনন্দের মধ্য হইতে উঠিবে বিষাদ।

বিদায় শালবনী।—বিদায় চন্দ্রকিরণরেখাঙ্কিত স্নিগ্ধোজ্জ্বল পথ,—ছায়ান্ধকার শীতল হাটতলা—বিদায় আমার নম্র মূক শান্তদৃষ্টি নিশ্চিন্ত ভঙ্গীতে উপবিষ্ট ধৈর্যশীলা প্রিয় পসারিণী দল।

চাঁদ উঠিল। আকাশ-আলো পৃথিবীতে তখনো নামে নাই। তবে অন্ধকার দূর করিয়াছে। শিশু ও বট-অশ্বত্থের ছায়াময় পথ—প্রবল বৃষ্টি বারণ করিতে পারে—সে ঘন শাখায় নিবিড় পত্রাতপ। লাইনের উপর একটা মালগাড়ি ঘোর কৃষ্ণকায় প্রাণীর মত নিশ্চল দাঁড়াইয়া। ষ্টেশনে যাইবার জন্য পুলও আছে। সুন্দর ছোট পুল। আঃ এত কি নির্জন,—এত কি শান্ত? এবার জ্যোৎস্না নামিল। কিন্তু শব্দ নাই—নিঃশব্দ পৃথিবী।

ছোট ষ্টেশন। যাত্রী সংখ্যা অতি কম।

হিম ঝরিতেছে,—শীত পড়িবে শীঘ্রই এবার।

সশব্দে ষ্টেশন কাঁপাইয়া গাড়ি আসিল।

একদল গাড়িতে—একদল প্ল্যাটফরমে।

ভাষাহীন নীরব অভিবাদন। এক বংশের বিস্তৃত শাখা প্রশাখা দিকে দিকে ছড়ায়। মূল এক।

মানুষের চিন্তাধারা সময় প্রবাহের সঙ্গে বহিয়া চলে। স্থিতি নাই—বিরাম নাই—অবিরাম প্রবাহশীল। অতীত কাল হইতে সে চিন্তাধারার উদ্ভব। জাগতিক অতীত কাল নহে—আপনার অতীত জীবন কাল। সেই অতীত হইতে সে চিন্তাপ্রবাহ উৎপন্ন হইয়া বহিয়া আসে; বর্তমানকে স্পর্শ করিয়া বর্তমানকে ঘিরিয়া ও বর্তমানের ভিতর দিয়া সে চিন্তাধারা বহিয়া যায় ভবিষ্যতের দিকে,—অনাগত অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে তার যাত্রা। যে অদৃশ্য ভবিষ্যতের কূল কিনারা নাই, কল্পনার অতীত; সমস্ত জ্ঞান বুদ্ধি প্রতিভা আলোচনা গবেষণা—এমন কি জ্যোতির্বিদ্যার অতীত যে অনন্ত ভবিষ্যৎ! আমাদের চিন্তাধারাও তেমনি অকূল অতলস্পর্শ। ছুটিতেছে সেই অজ্ঞাত

রহস্যময় ভবিষ্যতের দিকে অনিবার গতিতে, দুর্নিবার বেগে। কিন্তু হায়! বৃথা! বৃথা চেষ্টা। তুমি কি জান তোমার কি হইবে? কি আছে তোমার অদৃষ্টে? তবু এই প্রশান্তকারী সাধনা! কি ইহার মূল্য—কি ইহার সার্থকতা?

তরঙ্গিত চিত্তসমুদ্র তলে কোন্ চিন্তা স্থায়ী হয়? শুধু একটি মাত্র চিন্তা জনে জনের গোপন মন-মন্দিরে,—যে চিন্তার আভাস মাত্র অপরে জানে না। নিজের মনের মনো-মন্দিরে সঙ্গোপনে লুকাইয়া রাখে সেই একমাত্র চিন্তাটি অমূল্য রত্নের ন্যায়।

শালবন

গভীর রাত্রি। দিনের মত উজ্জ্বল জ্যোৎস্না।

দেখ ঐ প্রান্তর-পারে দিগন্তে আঁকা সূক্ষ্ম কৃষ্ণ রেখা। ঐ যে একশত হাত ব্যবধানে উন্নতশির মহাকায় নেউল ও অধোমুখ সৈনিক। শুভ্র জ্যোৎস্না-ধৌত ঘাসবন। পূর্বদক্ষিণ কোণে ঘননীল তরুশ্রেণীর উপরে আলো জ্বলিয়া উঠিল। বহু দূরে যেন আগুন লাগিয়াছে। বিনপুরা ষ্টেশনের আলো। সশব্দে গাড়ি উঠিল পুলের উপরে। একঘণ্টা দেড় ঘণ্টা পরে পরে গাড়ি যায় আসে, আলো জ্বলে—আর নেভে।

রাত্রির রহস্য অঞ্চল তলে ঢাকা সে সবুজ বনানী, রক্ত গৈরিক প্রান্তর—আকাশ ভরিয়া সে শুভ্র গোলাপী সিন্দুর ও অগ্নিবর্ণ মেঘমালার সুসজ্জিত অভিযান। দিকে দিকে রূপ ও ঐশ্বর্যের সমারোহ লুকানো আছে রাত্রির মায়া-জালে। লুকানো রহিয়াছে শরৎ-উষার সে উজ্জ্বল সিন্দুর বর্ণ, দিগন্তে ঘেরা শ্যাম প্রাচীর। ভুবনমোহিনী প্রকৃতির নিমেষে নিমেষে বেশ পরিবর্তন লুকানো আছে ঐ জ্যোৎস্নাদীপ্ত আনত বক্র আকাশ তলে। আছেন চির বিরাজিতা মণিকাঞ্চন ও কুসুমদামআভরণসজ্জিতা রাজরাজেন্দ্রাণী জননী ধরিত্রী, এবং গৌরবদীপ্তা অনন্ত শোভাময়ী বিশ্বপ্রকৃতি। মাতা ও কন্যা—শান্তি ও সৌন্দর্য।

হায়—এই সুধা-সমুদ্রে অবগাহন করিয়া কোন্ দিকে চাহিব? কোন্ কথা বলিব? কি ধন কামনা করিব?

সুখময়ী পরিশ্রান্ত, উপবিষ্টা। ক্লান্ত মুখের এক পাশে জোছ্না পড়িয়াছে।

ব্যাপার কি? শালবনীতে সুখময়ীর মন টিকে নাই;—'আহা বনালীকে কে দেখছে—'

পালক ইতি মধ্যে বনালীকে একবার দেখিয়া গিয়াছিল—বনালী বেশ ভাল আছে, খাঁচা হইতে বাহির হইবার জন্য আকুলি বিকুলি করিয়াছিল।

সে কথা শুনিয়া সুখময়ী আর মামিল না। হাটের দিনে পসারিণীদের কাছে ঘোরে, একথা ওকথা বলে, দু' এক পয়সার জিনিস কেনে—কিন্তু মনে সুখ নাই। শেষে দুপুরের গাড়িতে চলিয়া আসিয়াছে। আসিয়াই আদর করিয়া খাঁচা খুলিবামাত্র বনালী বিনাবাক্যে উড়িয়া গিয়াছে; সে এক হৈ হৈ ব্যাপার! সাধারণতঃ বড় গাছে সে বসে না; কিন্তু আজ গিয়া উঠিয়াছে সর্বোচ্চ এক শাল গাছে। অন্বেষণের ফলে সেখান হইতে আরও দূরে এমনি করিয়া রাত্রি হইল। শেষে অনেক চেষ্টায় তাহাকে ধরিয়া আনা হইয়াছে। এই অকৃতজ্ঞতার ফলে সুখময়ীর মানসিক অবস্থা শোচনীয়।

জগতের আদান প্রদান তো এমনি। খুব বেশি আশা করিও না। কষ্ট পাইবে। যতটুকু পার দাও—কিন্তু অতিরিক্ত দিয়া অনুতাপ ভাল নয়।

কত ক্ষুদ্র জগৎ সুখময়ীর, কত সামান্য সাধ, সেই তো উহার একমাত্র আনন্দ। রাশি রাশি পরিচ্ছন্ন কাঠি চাঁচিয়া পালিশ করা একটা কাঠিতে দু দিন চলে না। কতক্ষণে ভোর হইবে—বনালীর সমস্ত দুর্ব্যবহার ভুলিয়া ছাতুর গুলি করিতে বসিবে। কিন্তু দীর্ঘ বিরহের পরে অকৃতজ্ঞ বনালীর এই কি ব্যবহার?

চল আমরা হরিশ্চন্দ্র রাজার মত সবসুদ্ধ বনে যাই; কি সুখ সংসারে?—কিন্তু বণিকবৃত্তি ছাড়িবে কি? পুত্রকন্যার জন্য পাঠশালা, গৃহিণীর জন্য শাড়ীর দোকান—নিজের জন্য খবরের কাগজ—যোগাড় করিবে কি সেই শান্ত ছায়া-

নিবিড় বনে ? ক্রমে ক্রমে চায়ের পাত্র হইতে ধোঁয়া উঠিবে, উঠিবে উর্দ্ধমুখ কলের চিমনি হইতে ?—তখন বন হইবে নগর—নগর রাজধানী। জীবনের সকল আনন্দ পণ্যদ্রব্যের মত ঝিকিমিকি করিতে চাহিবে কি ?

তবে যাক্—প্রয়োজন নাই।

প্রথম যাম।

মেঘরাজ্যের যবনিকা উঠিল।

—নীলে গোলাপ—সবুজে গোলাপ, দুই দিগন্ত আরক্ত আভাময়—দুই দিগন্ত স্নিগ্ধ শ্যাম।

দ্বিতীয় যাম। ঝিল্লীর আমোদিত গভীর রজনী। আকাশে শ্বেতমেঘ ভাসিতেছে—বায়ু গতিহীন।

শ্বেতবর্ণ মহাবল ওই নব নাগপতি—

কেতন সহস্রদল—

তৃতীয় যাম। আকাশ জুড়িয়া এক শুভ্র প্রাচীর উঠিয়া আসিতেছে, মধ্য পথে শতধা বিচ্ছিন্ন হইল—সহসা চঞ্চল হইয়া ভাসিয়া চলিল পূর্বদিকে; বার বার সে নিবিড় আবরণ ভেদ করিয়া একটি উজ্জ্বলকান্তি তারা উঁকি দিতেছে; নির্জন নিশায় ঈষৎ কম্পিতা জ্যোতির্ময়ী তুমি কি বিশাখা ? শ্রবণা ? আর্দ্রা, পুষ্যা ?—না—তুমি স্বাতী ? মুক্তানিন্দী তোমার স্নিগ্ধ-প্রভা।

সহসা স্থির শাখাপল্লব বাতাসে চঞ্চল হইয়া উঠিল—বিপর্যস্ত দ্রুতগতি শুভ্রমেঘপুঞ্জ সমস্ত আকাশে ছড়াইয়া পড়িল।

চতুর্থ যাম। মহামহিমময় অনন্ত নীলাম্বর এক শুভ্র অতিস্বচ্ছ লঘু উত্তরীয় পরিয়াছেন।

শ্বেতমেঘের অভিযান ঠিক দক্ষিণ হইতে উত্তরে নয়,—কখনো পূর্বে গতি—কখনো পূর্বোত্তরে, তখন পূর্বে হাওয়া উঠিবে।

শ্বেতমেঘের যাত্রা শেষ হইলে তবে কৃষ্ণমেঘের পালা। যখন ঐ অম্লান শুভ্রকান্তি শ্বেতধূসর—ঈষৎ ধূসর—ক্রমে ঘোর ধূসর—ক্রমে কৃষ্ণাভ—ঘোর নীলকৃষ্ণ বর্ণ ধরিয়া গম্ভীর ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিবে—ক্রমে সমস্ত উজ্জ্বলতা, চাঞ্চল্য, বর্ণলীলাচ্ছটা ঢাকা পড়িবে সে ভয়ঙ্কর রূপের মধ্যে—। সব মিশিয়া নিশ্চিহ্ন হইবে কৃষ্ণবর্ণে।

গুরু গুরু গম্ভীর নিনাদ,—গুম্—গুম্—গুম্—জলভরা ডাক। চারিদিকে জলতরঙ্গ বাজনা বাজাইয়া কালো মেঘের ছায়া পড়িল, আকাশ ঢাকিল, পৃথিবী ঢাকিল। ঐ শোন ঝম্—ঝম্—ঝম্। আহা সুন্দর শরতে কেন এ উৎপাত। কিন্তু সুন্দর—বড় সুন্দর। অনুপম সুন্দর এই মহিমময় রূপ।

আমি প্রান্তরবাসী—

বন ও প্রান্তর—প্রান্তর ও বন ঘরছাড়া করিল আমাকে। উদাস গৈরিক প্রান্তর-সীমায় ঘনকৃষ্ণ অনুচ্চ প্রাচীর, সূর্যালোকহীন সান্ধ্য আকাশতল হইতে কোন ঘরের মায়া আকর্ষণ করে? এমন অকরুণভাবে ঘরের বাহির করিয়া কোন্ লাভ তোমার?

আমার মাথার উপরে পত্রাতপ, আশ্রয় কোমল বৃক্ষতল, চন্দ্রপ্রদীপ। প্রান্তর আঙ্গিনা। আমি মুক্ত স্বাধীন—ভয়হীন। বাধা নিষেধ নাই—মানি না বাধা নিষেধ। দুপুরবেলা আমি জনশূন্য নিস্তব্ধ প্রান্তর ব্যাপিয়া ঘুরিব, গো-পালের পাশে পাশে শালবনের ভিতরে খুঁজিয়া বেড়াইব খরগোস। বনের পাশে দাঁড়াইয়া দেখিব চকিত শৃগালের দ্রুত পলায়ন। আমি বর্বর বনবিহারী। অন্তরে আমার দুর্বার বন্য-উল্লাস।

ঘাসের বনে ফুলগাছ দিও না; কে চায় যত্নে তৈরি করা বাগানের ফুল? সাজানো সৌখীন উদ্যান কতটুকু আনন্দ দিতে পারে? কি আকর্ষণ আছে তার? একদিন যত্নের অভাব হইলে শ্রীহীন—কি মূল্য আছে সে কৃত্রিম শোভার?

নিজ ঐশ্বর্যগর্বে গর্বিত ঘাসবন অকৃত্রিম অনাবিল সম্পদশালী, পত্র-পুষ্পের প্রাচুর্যে অতুলনীয়। জল সেচন নাই—কাঁচি ছুরি চালানো নাই। জীবজন্তুর হাত হইতে সতর্ক হইয়া রক্ষা করিতে হয় না ; নিজের সুদৃঢ় শক্তিতে অনুপম শোভা লইয়া বিস্তৃত হইয়া আছে। সযত্নে সমস্ত বাগান সাজানো, ফুল বহিষ্কার করিয়া দিয়াছি। এক বন্য উল্লাস জাগে অন্তরে। এই আমার ভাল,—এই বিস্তীর্ণ সবুজ বন। বনপ্রান্তে ঐ সতেজ ঘন পল্লবযুক্ত বন্যবৃক্ষ-রাজি লাল, নীল, পীত, শ্বেত কুসুমে আলো হইয়া আছে।

বনের প্রান্ত

সুন্দর শালবন—

বর্ষাজলধৌত নির্মল শালবন।

অন্ধকারে অস্পষ্ট—ঘনকৃষ্ণ রেখাকার শালবন।

উজ্জ্বল জ্যোৎস্নায় কজ্জলকৃষ্ণ শালবন।

এই আমি, ঐ শালবন—সত্য—সত্য। কিন্তু কি মোহময় সত্য !

শালবন—তুমি অপরূপ, তুমি পরিপূর্ণ, তুমি নিরুপম। তুমি না থাকিলে কে চাহিত সীমাহীন প্রান্তরের রুক্ষ শূন্যতা ? সব শূন্য সার্থক তোমার মধ্যে মিশিয়া—তুমিই সার্থক করিয়াছ প্রান্তর। তুমিই তাহাকে ঘিরিয়া ঐ শোভনশ্রী দিয়াছ।

ঐ তুমি পূর্ব দিগন্ত হইতে পশ্চিম দিগন্ত পর্যন্ত সমভাবে প্রসারিত, তারপরে ধীরে ধীরে ক্রমনিম্ন হইতে হইতে প্রান্তরে মিশিয়াছ—কেন ?

আবার সেই শূন্য সুন্দর জনহীন নগরীতে—একদা যেখানে নগর হইবার কথা ছিল—সেইখানে অকস্মাৎ গগনস্পর্শী হইয়া উঠিয়াছ—সেই সুবিশাল ঘোর বনরূপ তোমার ভয়াবহ। সে তোমার গম্ভীর স্বতন্ত্র পরিপূর্ণ অপরিচিত রূপ। সে আমি চাই না। সুন্দর শিশু-শালবন। তুমিই আমার প্রিয়।

তোমাকে দেখিতে দেখিতে চোখে আমার জল আসে। নিঃশব্দ

নিস্তব্ধ রাত্রি ; শুধু প্রান্তরে শিয়াল ছুটিতেছে, শুধু বৃক্ষপত্রের মর্মর শব্দ, শুধু কোন্ এক ভয়ানক বন্যপ্রাণীর তীক্ষ্ণ রুদ্ধ গর্জন শব্দ শোনা যায় মাঝে মাঝে,—শুধু শৃগাল, ভীত শশক ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিল,—থাক্—থাক্—উহারা এই নীরবতার—এই নিঃশব্দ আদানপ্রদানের কোন ব্যাঘাত ঘটাইবে না।

সেই যেদিন তোমাকে দেখিতে গিয়াছিলাম—কি আনন্দ—কি মধুর অনুভূতি—সে আমি জানি আর তুমি জান—একমাত্র তুমিই। তোমার তরুণ শাখা-বাহুর আলিঙ্গনে তোমার কোমল পত্রাঙ্গুলির সস্নেহ স্পর্শে তুমি সযত্ন সমাদরে সাদর অভ্যর্থনা করিয়াছিলে। বন পার হইয়া পথভীতকে পথ দেখাইয়া দিয়াছিলে ?

দিগন্তশ্রী শালবন। সকলের অগোচরে—না—সকলের অগোচরে নয়—উপরে চন্দ্র তারা, নীচে বনস্পতি, জোনাকীপুঞ্জ—নিশাচর—বনচর ইহাদের সকলের সম্মুখে,—শুধু মানব চক্ষুর অগোচরে—এই সুসময়ে তুমি আমার অশ্রু, আমার ভালবাসা গ্রহণ কর।

বনের স্মৃতি

মনে পড়ে—মনে পড়ে, বন প্রদক্ষিণ করিয়া ফিরিবার পথে সেই কৃষ্ণকায়া বন্য সুন্দরী। যখন দেখিয়াছিলাম তখন তত ভাবি নাই। নির্জনতার অবসরে মনে পড়ে তাহাকে।

বাংলাদেশের কোন্ মেয়ে অমন নির্ভয়চিত্তে ভরা সন্ধ্যায় নির্জন বনের মধ্যে দাঁড়াইয়া কবরী সাজাইবার জন্য একলা ফুল ছিঁড়িতে পারিত ? কোন্ বঙ্গবালা অমন সাহসী, চোখেমুখে অমন উজ্জ্বল দীপ্তি ? এই দেশ বঙ্গদেশের মধ্যে ধরিলেও খাঁটি বাঙালী নয় এরা। বাংলায় রাখাল আছে—রাখালী নাই। বাংলার কোন্ মেয়ে এমন অকুতোভয়ে বনে বনে ঘুরিয়া বেড়ায় ? কোন্ মেয়ে মাঠে গরু চরাইতে আসে ? দুপুরবেলা নিকটস্থ জলাশয়ে স্নান করিয়া গাছতলায় দাঁড়াইয়া উন্মুক্ত বাতাসে ভিজা চুল ভিজা আঁচল শুকায় ? কাপড়ের

খানিকটা শুকাইয়া পরিয়া আবার অপর অর্ধাংশ শুকাইয়া লয়? কিম্বা গাছতলায় শুইয়া অলস কণ্ঠে মৃদু মৃদু গান করে?

বঙ্গবালার গতি ভীরু চকিত—চাহনি সলজ্জ কুণ্ঠিত, কোথাও মিল নাই তাদের এদের সঙ্গে। কাব্য রচনা চলিতে পারে, কিন্তু সংসারযাত্রায় স্বচ্ছন্দ নয়। ফুলের সঙ্গে তারার সঙ্গে উপমা দিতে চাও দাও—কিন্তু সীতা সাবিত্রী দময়ন্তী শকুন্তলার সঙ্গে কদাচ তুলনা করিও না। সীতা সাবিত্রী দময়ন্তী শকুন্তলা কেহই বঙ্গকুমারী নয়।

আর সেই গাছে চড়িয়া যাত্রা দেখা? সেও পল্লীবালা, কিন্তু কোন্ বাঙালীর মেয়ে পারিত শত চক্ষুর সম্মুখে অকুণ্ঠভাবে গাছের ডালে দাঁড়াইয়া থাকিতে? উচ্চ সামিয়ানার নীচে আসর—বিনা বাধায় সুন্দরভাবে দেখিয়াছিল, শুনিয়াছিল। সে রাত্রে তার মত অত ভালভাবে কেহই যাত্রা দেখিতে পায় নাই। ভিড়ে ঠেলাঠেলি করিয়া না বসিয়া স্বাধীনভাবে সুবিধা করিয়া লইয়াছিল। উজ্জ্বল আলোকে তার অনাবৃত মাথার খোঁপাটা, কাপড়ের লাল ফুলপাড়—হাতের চুড়ি, মুখের প্রসন্নতা, চোখের সাগ্রহ চাহনি, সবই তো সুস্পষ্ট ছিল—কিন্তু সে কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ করে নাই। অথচ সে গৃহস্থ ঘরেরই মেয়ে—সেই গাছটার পিছনে তার গরুর গাড়ি রহিয়াছে। সন্ধ্যায় গাছতলায় উনান জ্বালিয়াছিল। আবার ভোরবেলা আত্মীয়জনের সঙ্গে গাড়ি করিয়া নিজের গ্রামে ফিরিয়া যাইবে। কিম্বা যাত্রার দুই দিন থাকিয়া যাইতেও বাধা নাই। পুকুরে বা বাঁধে স্নান—হাটে দোকানে দরকারী কিম্বা সৌখীন জিনিস ইচ্ছাসুখে কেনা,—তারপরে উৎসবান্তে নিজের সংসার ধর্ম—কোথাও কি বাধে?

বন-সঙ্গীত

মেঘভার-প্রভাত—ঠাণ্ডা ঝোড়ো বাতাস! আচ্ছা বনালী! তোর এত মায়া কেন? একদিন মানুষকে কত ভয় করিয়াছিস্—আজ মানুষ তোর সবচেয়ে প্রিয়?

বনমালীর পালক বনমালীকে উঠিয়া-পড়িয়া শিক্ষা দিতেছে। ভোরবেলা বনমালীর কানের কাছে উচ্চৈঃস্বরে সর্ব-দেবতার নাম কীর্তন! বনালী বধির হইয়া যায় নাই—এই আশ্চর্য! সে ঘাড় ফিরাইয়া-ঘুরাইয়া শুনিতেছে—।

কেমন সুন্দর কাছে আসে—মাথা হেলাইয়া চাহিয়া দেখে, সকলের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ সারা হইলে পরে ডানা মেলিয়া রৌদ্র-স্নান করে। ফিরিয়া ঘুরিয়া ঘাড় হেলাইয়া প্রতি লোমকূপে রৌদ্র লাগায়।

খাঁচাটি ঝুলানো থাকে গাছে। দিনের খেলা শেষ করিয়া বনালী ঘাসবন ছাড়িয়া আসে। পালকের পায়ে ঠোকর দিয়া বসিতে বলে, তারপর উড়িয়া মাথায় ওঠে।—কানের ভিতর ঠোঁট দিয়া কি বলে, এবার ঘরে যাইবে।

খাঁচাটি পাড়িয়া দিবামাত্র খাঁচার উপর গিয়া বসে।

দিন দিন মানব-শিশুর মতন দুষ্টামি শিখিতেছে। ভয়ানক চালাক—প্রলোভন দিয়া ডাকিলে ছোঁ মারিয়া খাবারটি লইয়া পালায়।

—"বনালী! অ বনালী! পারিনে তোকে নিয়ে! "এই নে এই নে' যা —আয় আয়—" আসল কথা সুখময়ী বনালীকে চোখের আড়াল করিবে না। "ও দুষ্টু! পালিয়ে বেড়াচ্ছ?"

কিন্তু বনালী সুখময়ীকেই সব চেয়ে নাকাল করে। সুখময়ীর সমস্ত শাক ঠোঁটে করিয়া ছিটাইয়া ছড়ায়। পরম আনন্দে সুখময়ী বলে—"ভেবেছে ঘাস কাট্‌ছি, ফড়িং চায়। কি বুদ্ধি! কি বুদ্ধি!"

ঘাড় বাঁকাইয়া বনালী সব কথা শোনে, চোখ ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া সব কাজকর্ম অতি মনোযোগ দিয়া নিরীক্ষণ করে।

ইদানীং সুন্দর নালিশ করা শিখিয়াছে। প্রথমে কিচ্‌ কিচ্‌ করিয়া পায়ে পায়ে ঘোরে; অর্থাৎ 'আহার দাও'। সেদিকে দৈবাৎ কেহ যদি না লক্ষ্য করিল অমনি নালিশ! একবার যায়—একবার আসে—তীক্ষ্ণ ক্রুদ্ধস্বরে সমানে অভিযোগ জানাইতে থাকে, কিছুতেই শান্ত হইবে না, যতক্ষণ না বিচার নিষ্পত্তি হয়।

সুখময়ীর ইচ্ছা সর্বক্ষণ বনালী থাকে কাছে। বালাই পড়িয়াছে বনালীর—সারাদিন কত কাজ তার—ঘাসের মধ্যে ফড়িং খোঁজা—ডালে বসিয়া পাকা বকুল ঠোকরাইয়া ফেলা—ঠোকর দিবা মাত্র ফলটি মাটিতে খসিয়া পড়ে, তখন আর একটা, এমনি করিয়া গাছের তলায় এক রাশ জমা হয়—কিন্তু বনালীর আর খাওয়া হয় না। তারপরে দেখিতে আসে সুখময়ী কি করিতেছে,—অর্থাৎ বনালীর কাজ না অপর কিছু।

'ঐ যা, ছাতু নেই কি হবে ; আয় আয় এই যে আছে—একটু আগে মেখেছিনু—দিব্যি আছে—নষ্ট হয় নি। সোনামণি, মানিক মণি, আগ করো না—এসো'—

সকালের মাখা ছাতু ?—বহিয়া গিয়াছে বনালীর—এত কাঙাল নয় সে ; ছাতু নেই ? নেই কেন ? সজোরে পায়ের আঙুলে একটা কামড় দিয়া আক্কেল দেওয়া আর কি—বনালী ডালে গিয়া বসিল।

'একটু আটা মেখে উচি গড়ে দি—কি ভুলো মন—ছাতু আন্‌তে দিতে মনে নেই,—তাই বা কি, এক দিনের বাসী হলে সে ছাতু ছোঁবে ? থাক্‌গে আপদ যেখানে খুশী ! পক্ষী,—তার আবার এত নবাবী।'

—কিন্তু অতি যত্নে উচি যা তৈরি হইল—যে কোন ভদ্র ব্যক্তির লোভনীয় ! তুচ্ছ পক্ষীজাতিকে অবহেলায় দেবার মত আদৌ নয়।

'দেখলে ? দেখলে ? তামাসাটা দেখনা একবার।'

বিষম আক্রোশে বনালী উচি ছিঁড়িয়া টুকরা টুকরা করিয়া ছিটাইয়া ফেলিতেছে।

—এতটা ঘি দিলাম—নুন—কালজিরে—দূর মুখপোড়া, তোর সাতজন্মে খেয়েছিলি এমন উচি ? আমার মেহনৎ সার। মরগে উপোস্ করে, ছাতু সেই ওবেলা হাটে,—তার আগে পাবি কোথা ? যা-না—কিনে আন্ না গোলবাজার থেকে—ক্ষ্যামতা কত ! ছোট লোক পক্ষী জাত—আর কত বুদ্ধি হবে।

বনালী গাছে বসিয়া রহিল সারা বেলা। আহার, নিদ্রা—নিদ্রা দূরে যাক

স্নান ভুলিয়া সুখময়ী সাধ্য সাধনা করিতেছে। কিন্তু সে চুপ করিয়া আছে—এক আধ বার চাহিয়া দেখে মাত্র, নামেও না, আসেও না। মুখে একটি কাকলী নাই। ফড়িং ধরিল না; বকুল ফল খুঁজিল না; অভিমানে স্তব্ধ হইয়া রহিল। অনুতাপে সুখময়ীর চোখে জল পড়ে পড়ে—'বকেছি না? আগ হয়েছে! ওকি সামান্যি'—

—উকি? উকি? যেওনি উদিকে—হাবাতে শালিকগুনো এক্ষুনি কেমড়ে অক্ত বার করে দেবে সিদিনের মতন। শেষে ঝক্কি আমারি।

তারপরে ছাতু আসিবামাত্র সুখময়ী ঠোঙাটি সবে লইয়াছে—অমনি ঝাপটা দিয়া উড়িয়া আসিয়া পড়িল তীক্ষ্ণ এক ডাক ছাড়িয়া। সামলাইতে সামলাইতে ঠোঙা ছিঁড়িয়া কতক পড়িয়া গেল। এক হাতে বনালী, আর হাতে জল বাটি—ঘাসবনে বসিয়া সুখময়ী সযত্নে গুলি তৈয়ারি করিতেছে; বনালী ঘাড় বাঁকাইয়া দেখিতেছে। গুলি হইয়া গেলে বনালীকে ছাড়িয়া কাঠিতে বিঁধিয়া ধরিল, অমনি বনালী টপ্। আবার বিঁধিয়া ধরে—চক্ষুর পলকে টপ্। এত তাড়াতাড়ি গিলিয়া ফেলে—কাঠিতে বিঁধিতে সময়ে কুলায় না। যাক্—সন্ধি হইয়াছে; এ বেলা আর গোলযোগের আশঙ্কা নাই।

কিন্তু সুখময়ীর উপর রাগ করা ছাড়া আর কি কাজ নাই বনালীর? সে আসিয়া গায়ে বসিয়াছে; তার দিকে না চাহিলে—কথা না বলিলে—আদর না করিলে রক্ষা আছে?—অন্যদিকে চাইবে? অন্যের সঙ্গে কথা বলিবে? কাগজ পড়িবে? পড় তো দেখি!

নিমেষে কাগজের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া ঠোঁটে চিরিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া দিল কাগজটা; সেই টুকরাগুলি লইয়া কি ঝুটোপটি—যেন সীমানা হইতে কাগজটিকে নিঃশেষ করিয়া দিতে পারিলে তবে সে শান্ত হয়।

এক একটা কাণ্ড সারিয়া গাছে গিয়া বসে। ঐটি যেন তার মন্ত্রণাকক্ষ। দৈবাৎ একটা সুতার গুলি মিলিয়া গিয়াছে। চক্ষের নিমেষে সেটা

লইয়া অতি হর্ষভরে উড়িল। ঘাসের বনে খানিক ঘুরিয়া গাছে উঠিয়া বসিল—সুখময়ী গুলির উদ্দেশে সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়াছে। এ ডাল হইতে ও ডাল, ওখান হইতে সেখান বনালীর পায়ে পায়ে সূতার পাক খুলিয়া গাছের ডাল হইতে ঘাসের বনে সাদা ধপ্ধপে্ সুন্দর এক বিচিত্র মাকড়সার জাল সৃষ্টি হইয়াছে; জালটি ছোট নয়—বেশ বিস্তৃত। সূতা ধরিয়া বনালীকে নামাইয়া অনেক যত্নে তাহাকে মুক্ত করিয়া দিয়া সুখময়ী সগর্বে সহাস্যে সেই অপূর্ব জালটি গুটাইয়া এবং গুছাইয়া তুলিতে লাগিল। কিন্তু বনালী অতি গম্ভীর মুখে বসিয়া আছে। ভাবিতেছে—যে কাজটা করিল—সেটা ভাল, না মন্দ—অথবা কোন গলদ আছে ইহার ভিতর—যার জন্য এতটা নাকাল হইতে হইল তাহাকে।

জানি, আমি কত ক্ষুদ্র—নদীতটে এক বালুকণা মাত্র। কিন্তু কি হইবে শুষ্কং কাষ্ঠং-বৎ জ্ঞান আহরণে? জ্ঞানী কি সুখী? অপরিমেয় আকাঙ্ক্ষা—অপার তৃষা—আরও চাই—আরও কি আছে—আরও! কিন্তু মহাজ্ঞানী, কোন জ্ঞানী সমগ্র বিশ্বরহস্য জানিতে পারিয়াছেন? শুধু সমস্ত জীবন বনে বাস করিয়া শুষ্কং কাষ্ঠং-বৎ জ্ঞান আহরণেই অজ্ঞান অচৈতন্য। কত বৃথা অভিমান, যে বিশ্বের রহস্য জানিতে চান—সেই একমাত্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের রহস্য। হায় দাম্ভিক!—প্রজ্জ্বলিত অনলে ধাবমান পতঙ্গ। যেথায় নিমেষে নিমেষে কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইতেছে।

সম্পদশালী? সম্পদশালী হইলে কি বন ভালবাসে? পঞ্চপাণ্ডবের অধিকাংশ জীবনই কাটিল বনে—কিন্তু অন্তরে দুরন্ত রাজ্য-পিপাসা—কাম্যক বনে সাম্রাজ্য কামনা!—কিন্তু সেই সাম্রাজ্য লাভের পরে সুখ আর মিলে নাই কপালে। সুখ যাহা বনেই মিলিয়াছিল।

সীতা হরণের পূর্বের যে বনবাস, গুহক মিত্র, রামচন্দ্রের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সুখের কাল সেই সময়টি। সীতারও, লক্ষ্মণেরও, তিন জনেরই মর্ত্য-জীবনের সুখ-শান্তি যা বনবাসের কালে।

আর সেই নির্বাসিত ডিউক—যিনি বনবাসকে সাদরে বরণ করিয়া পরমানন্দে কাল কাটাইয়াছিলেন।

Under the greenwood tree,

Who loves to lie with me.

কিন্তু হৃত-সম্পদ ফিরিয়া পাইবার সংবাদ পাইয়া পুনরায় রাজ্যে যাইবার আনন্দে কন্যার বিবাহ উৎসব লইয়াই ব্যস্ত রহিলেন। আর একবারও কি সেই সবুজ বনের কথা স্মরণ করিয়াছিলেন? যে বন ছিল তাঁহার অসময়ের নিরাপদ আশ্রয়?

হায় বনবাসী—কৈ তোমার বনশ্রী? দিনে দিনে সে অনুপম শোভা ম্লান করিয়া দিল কি সে নৈশ শিশিরপাত? আকাশে মেঘে পৃথিবীতে ধূসর ছায়া কেন? শ্যাম তরুশ্রেণী ঈষৎ ধূম্রবর্ণ। দিকে দিকে চারিদি:ক সে উজ্জ্বল আনন্দ-আভা যেন নিবিয়া আসিতেছে। উষার আলো তেমনি ঘোর রক্ত উজ্জ্বল সিন্দুর-ঢালা। কিন্তু প্রকৃতির সে নয়নাভিরাম উজ্জ্বল সবুজশ্রী কই? এ কি ম্লান পীত আভা শালের বনে?

ম্লান গৈরিক প্রান্তরে নিরুৎসাহ ধেনু-বৎস, নিরুৎসাহ রাখাল, নীড়াভিমুখী পক্ষীকুল নিরুৎসাহ।

আবার বর্ষা—অকাল বর্ষা—বন্যাধারায় সব ডুবিল। সংবাদ পত্রে জ্যোতিষ গণনা নিয়মিত আছে কিন্তু এই আকস্মিক বিপর্যয়ের উল্লেখমাত্র নাই। হয়তো সপ্তাহান্তে সঠিক বিবৃতি বাহির হইবে। তবে কেন বৃথা পূর্বাভাস দিয়া সতর্ক করিবার চেষ্টা?—একবারও তো দেখিলাম না গণনা ঠিক ঠিক মিলিল।

মুহূর্তে মুহূর্তে বৃষ্টি, মুহূর্তে মুহূর্তে বিরাম। বৃষ্টি কমে—নিস্তব্ধতা আসে। বৃষ্টি আসে, সঙ্গে ঘোর বাতাস, যেন প্রবল ঝড়। কে জানে নদীতে সাগরে কোন্ প্রলয় ঘটিতেছে!—মাঠ ডুবিল—ক্ষেত ডুবিল—ডুবিল পথ-ঘাট।—কূলে কূলে ভরা কংসাবতী, যদি উছলিয়া উঠে?

সায়াহ্নে হয়তো ক্ষণিকের জন্য বর্ষণ বন্ধ হইল। দপ্ দপ্ করিয়া আলোকটা জ্বলে, নিঃশব্দে সে আলো পড়ে ঘাসের বনে, নিঃশব্দে সে আলোক-ধারাধৌত আমবকুলের চিক্কণ সব পত্ররাশি চিক্ চিক্ করে। নিস্তব্ধ প্রকৃতি, নিথর পৃথিবী,—ঘনমেঘভার, আবৃত আকাশ। কদাচিৎ শোন ভেককুলের রব। কিম্বা ঝিল্লীর একটানা ধ্বনি—ঝিঁ-ই-ই-ই-ই—রী-ই-ই-ই-ই,—রী রী রী।—অথবা কঙ্করময় ভিজা পথে চলমান শান্ত্রীর ভারী ভারী ভিজা বুট জুতার শব্দ। কদাচিৎ রিজার্ভ এলাকায় কোন অনভিজ্ঞ অনধিকার প্রবেশকারীর প্রতি পথপার্শ্বরক্ষী—সশস্ত্র প্রহরীর উচ্চ তীব্র নিষেধ,—সতর্ক আদেশ।

আবার বৃষ্টির নিবিড় শ্বেত ধূসর জালে চারিদিক ঢাকা পড়িল,—তীরের মত তির্যক ক্ষিপ্র সে ধারা। উত্তর-দক্ষিণ কি পূর্ব-পশ্চিম বাতাস—কি বুঝিবে তুমি? চারিদিক হইতে সমান জোরে আসে সে ভীষণ বেগবান জলধারা।

একদিন দুইদিন তিনদিন—তিনদিন পরে জ্যোতিষ গণনা—"পূর্বাভাস—সতর্কীকরণ ও বিশেষ সতর্কীকরণ। "আগামী চব্বিশ বা ছত্রিশ ঘণ্টার মধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গে" ইত্যাদি।—কোথাও বা—"যে দুর্যোগ [illegible]লিয়াছে,—আরো ছত্রিশ ঘণ্টা স্থায়ী হইতে পারে।"

সৈনিকের পদপ্রান্তে দাঁড়াও,—বৃষ্টি হইতে কথঞ্চিৎ বাঁচিতে পারিবে।

জোর হাওয়া—ঝড়ের মত হাওয়া,—হাওয়ার সঙ্গে ঝির ঝির বৃষ্টি,—কনকনে ঠাণ্ডা পড়িয়াছে। বৃষ্টিহীন দুর্যোগময় দিবস।

আকাশ-ভরা কালো মেঘের উপর রৌদ্ররেখা ছড়াইয়া পড়িল। বিদায়ের পূর্বে আশীর্বাদ করিয়া হাসিয়া সূর্যদেব অদৃশ্য হইলেন।

শালবনের পাখীটি এত বড় হইয়া উঠিয়াছে?—এই সেই দিনও ছোট ছিল দেখিতে; চঞ্চুটি আরো ঊর্ধ্বে তুলিয়াছে; কি বলিষ্ঠ কোমল আকৃতি। ঐ সে কণ্টক চূড়া পরা গ্রীবা বাঁকানো বেজীটি, তার পাশে সারি দিয়া বানর—কবুতর—ময়ুর। বিভিন্ন রূপে বিভিন্ন বেশে সীমান্তরক্ষীগণ।

বাতাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়া মুক্ত প্রান্তরে একটা গো-বৎস ছুটিয়াছে—তার পিছনে ছুটিয়াছে রাখাল।

পূর্বের চেয়ে শালবন কত উচ্চ, কত নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে। পত্রাবরণ কি ঘন, কি নিশ্ছিদ্র।

আছে সবই—কিন্তু নাই শুধু সে সতেজ সবুজ সজীবতা।

ঐ ঘোর সন্ধ্যার নিস্তরঙ্গ বায়ুমণ্ডলে ক্রীড়ামত্ত বন্দীগণের উল্লাসধ্বনি উঠিয়াছে।—যেন রুদ্ধ আক্রোশে গর্জমান পিঞ্জরাবদ্ধ শার্দূলবর্গ।

আছে শালবন—বিশাল প্রান্তর—ঘন নীল তরুশ্রেণী, ধনু-বঙ্কিম অস্ত দিগন্তে রক্তিম আভা, শান্ত সন্ধ্যাকাশপটে হীরকোজ্জ্বল নক্ষত্র—অতিকায় নকুল—মহাকায় সৈনিক—দিকে দিকে দিকরক্ষীগণ,—কিন্তু প্রকৃতি স্বয়ং নিরুৎসাহ, সমস্ত মাধুর্যকে হরণ করিয়া লইয়াছে নিঃশেষে। তাই সৈনিকের উজ্জ্বল বেশ ম্লান—সমগ্র অরণ্যরাজ্য কুহেলি-ম্লান। শিশির-ব্যথিত বনভূমি!

মূর্খ বনবাসী, মায়া অঞ্জন মুছিল কি?

সেই অদৃশ্য চিত্রকর,—বর্ণ ভাণ্ডার তার রিক্ত, অথবা শ্রান্তিভারে বিশ্রামরত,—কিম্বা নব নব বর্ণ ও শক্তি সঞ্চয় করিতে মন দিয়াছে। তাই কি তূলিকা তার গতিহীন? চিত্রপট নিশ্চল? অথবা সে চিরগতিচঞ্চল তূলিকা পৃথিবী ছাড়িয়া উঠিয়াছে আকাশে,—নহিলে আচম্বিতে মেঘলোকে এহেন নব রূপ বিকাশ কেন? প্রকৃতি যখন বসন্তে পত্রভূষায়, গ্রীষ্মে পুষ্পসজ্জায়, বর্ষায় জলধারায়, সজ্জিত সুস্নিগ্ধ—আকাশে তখন শুধু গ্রীষ্মে শুভ্রধূসর মেঘ—বর্ষায় কৃষ্ণধূসর, বসন্তে শুভ্র,—উদয় অস্তে মাত্র লোহিত কিম্বা পীতাভ জ্যোতি। কিন্তু প্রকৃতির রূপ ম্লান হইবার সঙ্গে সঙ্গে মেঘরাজ্যে ঐশ্বর্য-সমারোহ জাগিয়া উঠিয়াছে। ঐ সায়াহ্নে রক্ত পীত নীল ধূসর কৃষ্ণ মেঘরাশি স্তরে স্তরে বিচিত্র আকৃতি ধরিতেছে।—ঐ শ্রেণীবদ্ধ সুসজ্জিত শুভ্র অশ্বদল—দক্ষিণ দিগন্তে, ঈষৎ দূরে ধূম্রমুখ শ্বেতকায় বিরাট কুম্ভীর মুখ ব্যাদান করিয়া আছে। দক্ষিণ-পশ্চিমাকাশে লোহিত বর্ণ পক্ষীকুল বিশাল পক্ষ বিস্তার করিয়া উড্ডীয়মান।

পশ্চিমে রক্তবর্ণ পুষ্পভার বৃহৎগুচ্ছাকারে শোভমান।—ধাবমান পীতাভ বৃহৎ কচ্ছপ,—তাহার পার্শ্বে ভীষণাকার হিংস্র সরীসৃপ—শ্বেত পীতবর্ণে যাহার প্রান্তদেশ রঞ্জিত। এবং উত্তরে ঐ ধূম্র-লোহিত ধূসরবর্ণ অগণ্য অসংখ্য হস্তী নীল নভে সুগঠন দীর্ঘ শুণ্ড বিস্তার করিয়া ক্রীড়াশীল—মৃদু শরৎ-বায়ুতে ঈষৎ চঞ্চল, দিগন্ত জুড়িয়া সদলে সগর্বে দিগ্বিজয়ে অভিযান করিয়াছে।

কিন্তু রিক্ত-সৌন্দর্য শালবন!

—নিরানন্দ শালবন!

রৌপ্যচূড় ধূম্র মেঘতলে মলিন শালবন।

ধনুকবক্র ধূসর আকাশে আঁকা অনুজ্জ্বল শালবন।

ঘনশ্যাম তরুশ্রেণীর গাত্রে—পীতাভ শালবন।

রক্ত গৈরিক প্রান্তর সীমায় নীরস শালবন।

নীলাভ নীরদ-পুঞ্জের নীচে নিষ্প্রভ শালবন।

নিশা শেষের লোহিত-আভা-মণ্ডিত-দিগন্তে ম্লান সবুজ ধূমাচ্ছন্ন শালবন।

বৃষ্টিজলে ঘোর বাত্যা-বিধ্বস্ত অনির্মল ঊষায় শ্রীহীন শালবন।

তবে আর কেন?—

একদিন তুষারঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ ঘোর কুজ্ঝটিকাসঙ্কুল এক দুর্যোগময় প্রত্যূষে জ্যাকের বন্ধু বলিয়াছিল—

—"পুষ্প শোভা গিয়াছে, এবার আমি যাই।"

সেই তুষারাবৃত হিম ঝটিকাক্রান্ত অস্পষ্ট প্রভাত, তেমন নিষ্ঠুর প্রভাত আর একটি বুঝি আসে নাই আর,—এবং সেই দুরন্ত দুর্যোগাকুল প্রভাতে জ্যাকের বন্ধু যে কথাটি মুখে উচ্চারণ করিতে পারে নাই,—সেই কথাটি আজ আমি বলি—

বিদায় শালবন!

বনবাসী !—কোথা তুমি ঘর বাঁধিবে ? ভ্রমণ-শেষে দাঁড়াইবার স্থান—দীর্ঘ পর্যটনের পরে দিনান্তে সান্ধ্য-বিশ্রাম কুটীর,—কোথায় সে ?

যে দেশ জলহীন—তরুশ্রেণী ফলহীন—ক্ষেত্রশস্য সম্পদহীন, প্রাণপণ চেষ্টায় অর্ধাংশ ফলও ফলে না ; ক্রোশব্যাপী অরণ্য—শুধুই সে অরণ্য ; নিবিড় শালবন—শুধু কীটপতঙ্গের নিবাস। শাল—মহুয়া বহেড়া তোমার কোন্ অভাব মোচন করিবে ? প্রান্তরব্যাপী দীর্ঘ তৃণদণ্ড- গৈরিক বর্ণ তৃণদণ্ডরাশি কোন্ উপকারে আসিবে বল ?—রুক্ষ অনুর্বর প্রস্তর-কঙ্করাকীর্ণ কঠিন মৃত্তিকা,—ফলপুষ্প নদীনির্ঝরিণী-বিরল দেশ।

তুমি কি বজ্রকীট ?—বন বিড়াল ?—শশক ?

বঙ্গদেশ ?—সঙ্কীর্ণ পথ—সঙ্কীর্ণ সমতল ভূমি—ঝোপে ঝাড়ে কাঁটা জঙ্গলময় দেশ ! কচুরীপানা-ঢাকা খাল—ঘোর সবুজ শৈবাল এবং কুচিপানা-ঢাকা নিস্তরঙ্গ ডোবা পুকুর, বিছা—মশক—পিপীলিকার রাজত্ব—বাঁশবন বেতবন ঘেরা কোন গৃহটি তোমার প্রিয় ? সেখানে কোথায় তোমার মুক্ত দিগন্ত—অবারিত প্রান্তর ? দৃষ্টি তোমার চারিদিকে ধাক্কা খাইয়া ফিরিয়া আসিবে না কি ?

তুমি কি বনমানুষ ? উদ্বিড়াল ? বাঘ-ডাঁসা ?

কিম্বা বরেন্দ্রভূমে ভীতিসঙ্কুল বিষম অরণ্যের মধ্যে শাণিত অব্যর্থ লক্ষ্য ধনুর্বান হাতে—সঙ্গে তীক্ষ্ণ সন্ধানকারী নিঃশব্দ শিকারী সারমেয়,—শান্ত বনতল আলোড়িত করিয়া হৈ হৈ রবে আক্রমণোদ্যত হিংস্র প্রাণীর সহিত যুদ্ধ বাধাইবে ? অথবা পলায়নপর ত্রাসিত নিরীহ বনচর জীবের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া ঝাঁকড়া কেশপাশ উড়াইয়া বন হইতে বনান্তরে ছুটিবে ?

তুমি কি নিষাদ ?—কিরাত ?—শবর ?—

অথবা আরও উত্তরে—যে অতি বিস্তৃত গগনস্পর্শী গম্ভীর শালবন, যে বিরাটকায় শালবৃক্ষের তুলনা কোথাও মিলে না, নিবিড়তায় যে দুর্ভেদ্য, ভীষণতায়

ভয়াবহ, শাখা পত্রাবরণের ফাঁকে রৌদ্র জ্যোৎস্নাও যেখানে প্রবেশ করিতে পারে না, হিমালয়ের পাদদেশে সেই অতি প্রাচীন ভয়ঙ্কর অরণ্যাবলীর অভ্যন্তরে ?

তুমি কি ব্যাঘ্র ?—বরাহ ?—গজরাজ ?

তবে কোন্ দেশ ? দুর্গম তুষারাবৃত বিরাট পর্বত ? হিম ঝটিকার মধ্যে কম্পিত কলেবরে কোন্ আশায় বরফ ভাঙিয়া সে দুরারোহ পর্বতারোহণ করিবে ? জনমানবশূন্য জীবজন্তুহীন—ফলপুষ্পবৃক্ষলতামুকুলমঞ্জরীশূন্য সে কঠিন তুষারাবৃত কর্কশ পার্বত্যভূমি কোন দুঃখে তুমি চাহিবে ?

তুমি কি সীল ?—মেরু ভল্লুক ?—বীবর ?

আমি ঘর বাঁধিব পর্বত-পাদমূলে,—পার্বত্য দেশে। অগম বন্ধুর উচ্চ প্রদেশে আমার কুটীর হইবে। কিন্তু পর্বতের উপর নহে,—পর্বতের উপর দারুন শীত,—স্নান না করিয়া পাহাড়ী হইয়া যাইব শেষে।

পর্বত থাকিবে আমার এক দিকে—অন্যদিকে তীব্র বেগশীলা ঝরনা। সম্মুখে উদার প্রান্তর। সেই দেশে শৈলমূলে আমার কুটীর।

আমি গিরিশ্রেণীর অনন্ত গম্ভীর শোভা দেখিব। অনন্ত নীলাকাশে—নিবিড় বনের ভীমকান্তরূপ আমায় সব ভুলাইয়া দিবে। সেই নির্জন প্রদেশের অনন্ত নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিবে খরস্রোতা ঝরনার মধুর কুল্ কুল্ ধ্বনি। জলধারা আমার হাতের কাছে—অঞ্জলি করিয়া পান করিব ইচ্ছাসুখে। আমার চিক্কণ বল্কল নিত্য ধৌত করিব সে জলে,—যখন ইচ্ছা অবগাহন করিব।

মাঝে মাঝে তোমরা আমায় দেখিতে যাইবে না ? বনের পাশে উঁচু নীচু পথ বহিয়া আসিতে কুটীর দেখিয়া চিনিবে। চিনিবে সে মৃৎপ্রদীপের স্নিগ্ধ ও ঈষৎ কম্পিত শিখাটি।—ঝরনার ধারে প্রশস্ত শিলাসনে বসিতে দিব। পত্র-পুটে বনফল দিয়া অভ্যর্থনা করিব। সম্ভাষণ করিব বনপুষ্পরাশির অঞ্জলি

দিয়া। আমার শশক হরিণ নকুল ও পক্ষীকুল নির্ভয়ে তোমার গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া সাদর অভিনন্দন জানাইবে। তাহারা জানে তুমি তাদের হিংসা কর না—ভালবাস।

স্নিগ্ধ সন্ধ্যাকাশ তলে বসিয়া দেখিও সে দিগন্ত-বিস্তৃত প্রান্তরের উন্মুক্ত সৌন্দর্য।—দেখিবে সে ভীমকায় শৈলমালার গম্ভীর রূপ।—আরো দেখিও—দিনে মোহময়—রাত্রে ভয়াবহ—মায়াবী সে গহন বন—কান পাতিয়া শুনিও আমার নৃত্যময়ী জলধারাটির মৃদু মধুর সঙ্গীত।

কোথাও কি আছে এমন বন? চির-বসন্ত, যেথায় শীত-বর্ষার অধিপত্য নাই, উজ্জ্বল অম্লান বনপুষ্পিত বন—বনপথ কুসুমাবৃত; ফলভার-নত। বিশাল তরু—নির্মলসলিলা স্রোতস্বতী, কোথায় সে বন?

ছিল একদিন—অতুল ঐশ্বর্যশালী পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের নৈমিষারণ্য, সৌনকাদি মুনিগণের পবিত্র যজ্ঞভূমি, যে বনে ইন্দ্রশ্রেষ্ঠ নৃপকুল সভায় প্রবেশ করিয়া ধূলিস্পর্শে জীবন ধন্য মানিত; সেই দেববাঞ্ছিত নৈমিষারণ্যে চিনির কল বসাইল কে?

এসো তবে পর্বতারণ্যে, যে অরণ্যের গহনতম প্রদেশে কঠোর ধ্যানমগ্ন—শীতে রৌদ্রে বৃষ্টিতে অবিচল উগ্রতপা ঋষিবর, পিঙ্গল জটাভারে যাঁহার পক্ষী-নিবাস, বৃক্ষভ্রমে মৃগকূল যাহার প্রস্তরবৎ কঠিন অঙ্গে শৃঙ্গ ঘর্ষণ করে—সেই মহাতপোধনের স্পর্শপবিত্র স্বর্গনিন্দী বনানী কই? জান কি সন্ধান? পথ দেখাইতে পারিবে কি?

আমি সেই বনের অভিলাষী,—যে বনের সীমান্তে সীমান্তে গহনে গহনে কুরুরাজ পাণ্ডু রাজ্যভার এড়াইয়া প্রিয়া মাদ্রীর সহিত ভ্রমণ করিতেন,—সেই চৈত্ররথ বন; যে মনোরম কাম্যক বনে তেজস্বিনী রাজমহিষী অতুলনীয়া কৃষ্ণা স্বামিগণ সঙ্গে বাস করিয়াছিলেন। তুমি কি জান না? তুমি চাহিবে না কি? এসো আমরা সেই বনে যাই। বায়ু যেথায় সশঙ্ক স্নিগ্ধ মন্দগতি।

বনবাসী সেই বন-অভিলাষী ; যে মহা শালবন পর্বত কন্দরে, যে ভদ্রানদী মেঘবতী মহানদী সৌরবতী স্বর্ণরেখা শৈলে শৈলে শৈলারণ্যে প্রবহমানা, যে অরণ্যে ঋষি-অভিলাষী অমৃততুল্য ফলভার—চির-সবুজ বিশাল তরুশাখে চির শোভমান। জলধিতলনিবাসী পক্ষশালী মৈনাক পর্বত নহে—অচল গিরিবর শতশৃঙ্গী রৈবতক ধবল পর্বত চিত্রগিরি যে পর্বতারণ্যের তরুলতা চিরহরিৎ পুষ্পসৌরভ ভারাক্রান্ত মন্দগামী পবন—ফলশালী তরুরাজির আশ্বাসদায়ী ছায়াশীতল বনবীথিকা—এবং অমৃতনীরা প্রবাহিনী। বৃক্ষশাখে লতায় তৃণে গুল্মে দিকে দিকে শতবর্ণ গন্ধৈশ্বর্যময় পুঞ্জ পুঞ্জ পুষ্পগুচ্ছ-স্তবকে অরণ্যভূমি উজ্জ্বল সুবাসামোদিত। সূর্যচন্দ্র নক্ষত্রালোকে পর্যায়ক্রমে নিয়মিত আলোকশালী—।

সেই অরণ্য, যে অরণ্যের দিকে দিকে সীমান্তে সীমান্তে দুর্ভেদ্য দুরভিগম্য শৈলপ্রাকার, ঊর্ধ্বে আকাশে দিকে দিকে সীমান্তে সীমান্তে নীল মেঘ-প্রাচীর,—সেই অনন্ত নীল গগনস্পর্শী মহামহীয়ান ঘোর নীলকৃষ্ণ দুর্লঙ্ঘ্য পর্বত-অঙ্কে শিলা মঞ্জীরচরণা কলধ্বনিশীলা শৈল নির্ঝরিণীর কুসুমাস্তীর্ণ তীরে বন্ বল্লরী বেষ্টিত পার্বত্য পত্রাচ্ছাদিত অতুল আনন্দ এবং অনন্ত প্রশান্তিময় একটি শিলাগৃহ,—তথায়—

আরাধিতো যদি হরি স্তপসা ততঃ কিম্ ?
নারাধিতো যদি হরি স্তপসা ততঃ কিম্ ?
অন্তর্বহি র্যদি হরি স্তপসা ততঃ কিম্ ?
নান্তর্বহি র্যদি হরি স্তপসা ততঃ কিম্ ?
